আর্টফাইন, ভল্যুম-০৫, জুন-২০২১, পৃ. ৬১ - ৯১

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকর্মে প্রাপ্ত দারুশিল্পের স্বরূপ

শামীম রেজা*

ভূমিকা

একটি জাতির মানস সংস্কৃতির মূর্ত অভিব্যক্তি–সাহিত্য, শিল্প-ভাস্কর্য-নৃত্য-সংগীত, থিয়েটারে। একথা সর্বজনবিদিত সত্য এই যে, কোন জাতির সংস্কৃতির বিশেষ একটি শাখা একচ্ছত্র নয়। শিল্পের বিষয় বরাবর মানুষ ও মানব সমাজ অজ্ঞাত সত্যের সম্ভাবনা অভিজ্ঞতার সমর্থনে আবিষ্কার প্রয়াসই শিল্পের কাজ। শিল্পীর কাজ। এমতাবস্থায় ব্যবহারিক জীবনের সকল দিকের পরিচর্যাই শিল্পের অনুষঙ্গ প্রসঙ্গরূপে সৃজনকর্মে স্থান লাভ করে। প্রচলিত জীবন পদ্ধতির আলোকে বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থনীতিক অবস্থায় ব্যক্তিমানুষ কিংবা সামষ্টিক মানুষের কাঙ্খিত ও সম্ভাব্য জীবনের রূপাঙ্কন প্রয়াস থাকে বলেই সাহিত্যের আবেদন সর্বজনীন। জীবনকে যথাযথ ও বিশিষ্ট করে তোলার জন্য কবি সাহিত্যিককে সেই বিশেষ সমাজের যাপন পদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য। তাই চরিত্রগুলোর সমাজ বিন্যাসে কোন আর্থনীতিক স্তরে অবস্থান করে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা মূর্ত করতে হয়। সৃষ্ট চরিত্রের ত্রিমাত্রিক রূপাঙ্কনের প্রয়োজনেই নির্দিষ্ট সমাজপদ্ধতিতে ব্যক্তির পারিবারিক কাঠামো এবং তার অভ্যন্তরে দৈনন্দিন জীবনটির রূপ কেমন তা চিত্রায়ণও সাহিত্যিকের করণীয়ের অন্যতম। ফলে ব্যক্তিগত জীবন, চরিত্রের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বিশেষভাবে মূর্ত করার প্রয়োজনেই একটি যুগের সাহিত্যে সে যুগের সামগ্রিক অবস্থার চালচিত্রটি অঙ্কন করেন সাহিত্যিক। ফলে কোন যুগের যে কোন সাহিত্য নিদর্শনে সে যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন ঘটে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির দারুশিল্পের গবেষণাপত্র রচনায় তাই ঐ যুগের বাংলা সাহিত্যে বিধৃত গার্হস্থ জীবন পর্যবেক্ষণ অনিবার্য। আমাদের প্রত্যাশা উপযুক্ত কালের বাংলা সাহিত্যে উপজীব্য জীবনচিত্রে ব্যাবহারিক সামগ্রী, খাট-পালঙ্ক, দরজা, মন্দির স্থাপত্য, প্রাসাদ, অলংকরণ কাজে দারুকর্মের বহুল ব্যবহার হয়ে থাকবে। শিল্পের সহজলভ্য উপকরণের বিচারে কাঠ এতদঞ্চলে সর্বাগ্রে বিবেচ্য। তাই বৃহৎ বঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগে দারুশিল্পের প্রসারের বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিত্তভেদে এর ব্যবহারের বিভিন্নতা প্রত্যাশিত। পালঙ্ক কেবল শয্যাপাতা এবং আরামদায়ক শয্যার আধার হলেই চলবে কী করে! তার দৃশ্যগত সৌন্দর্য না থাকলে ধনীর

* **শামীম রেজা :** সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশালায়ত গৃহে তা মানানসই না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিকবোধ মানুষের রুচির উন্নয়ন ঘটায়। তাই আটচালা, চকমিলান গৃহ যেমন বিত্ত, অহংকার এবং সামাজিক অবস্থান নিশ্চিত করে, তেমনি তা ঐ সমাজে শ্রেণি বিশেষের সাংস্কৃতিক মান নির্ধায়কও। ফলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য দারুশিল্পের স্বরূপ আবিষ্কারের জন্য পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে মনে হয়েছে।

প্রাচীন শিল্পমাধ্যমের একটি হলো দারুশিল্প। কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ তা বিলীন হতে চলেছে। কারণ হিসাবে দেখা যায়, জলবায়ুর চরম শুষ্কতা, আবহাওয়ার পরিবর্তন, রোদ বৃষ্টি ঝড়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া এবং অতিপ্রাচীনত্বের কারণে এই শিল্পমাধ্যমের নিদর্শন আজ দুর্লভ। তাই প্রচীনকালের দারুশিল্পের নিদর্শন খুঁজতে আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে আশ্রয় নেওয়া অবশ্যকর্তব্য। কেননা চিত্র, ভাস্কর্য, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি যেমন এক ধরনের শিল্প, তেমনি সাহিত্য অন্য ধরনের শিল্প। প্লেটোর মতে, “চিত্র হল পটে আঁকা ছবি, আর সাহিত্য হল পত্রপুটে ভাষার ছবি।” গ্রিক পণ্ডিত সিমোনাইডিস বলেছেন যে, “চিত্র হচ্ছে নীরব কবিতা, আর কবিতা হচ্ছে মুখর চিত্র।” (জামান, জুন, ২০১৫ঃ৪৭)

বিজ্ঞানের অগ্রগতি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে আবিষ্কৃত যন্ত্র শিল্প কারখানায় ব্যবহার করে বিশ্বময় মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থায় এসেছে সামগ্রিক পরিবর্তন এই পরিবর্তন কেবল আর্থনীতিক অগ্রগতিই সাধন করেনি, মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের ধরন এবং বৈচিত্রও বাড়িয়ে দিয়েছে। এককালে কাঠের ঘর আসবাবপত্রই ছিল যাপনের উপকরণ। পরিবর্তীতে আর্থনীতিক ব্যবস্থায়, সামন্ততান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থায় বহু ধর্মের বাঙালি ধর্মীয় মূল্যবোধ আঁকড়ে ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্ণ হিন্দু সমাজ আদিকাল থেকেই পেশাভিত্তিক বর্ণ শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। ভোগসর্বস্বতা শুধু উচ্চবিত্ত ব্রাহ্মণ ও সামন্ত সমাজেই বিদ্যমান ছিল। তাদের ভোগের উপকরণ যোগাত উৎপাদক শূদ্র শ্রেণি। কামার-কুমার, তাঁতি, সূত্রধর নামের উৎপাদক। বিভিন্ন সহজলভ্য ধাতব পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ হলে কাঠের ব্যবহার কমতে থাকে। দরজা, জানালা কখনো দেয়াল, পালঙ্ক, সিংহদরজা, মন্দিরের আসবাবপত্র এবং খেলনা ইত্যাদি ব্যবহার্য সামগ্রী কাঠ দ্বারা তৈরি করাই ছিল দস্তুর। নদীবহুল বাংলাদেশে ৬-৭ মাস দীর্ঘস্থায়ী হতো বর্ষাকাল। বর্ষাকালে একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন এবং দেশ-বিদেশে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হতো বিচিত্র নামা বিভিন্ন আকৃতি-আকারের কাঠের তৈরি নৌকা। দারুশিল্পের সে কালের অবস্থা এবং তার বৈশিষ্ট্য উপযুক্ত সামগ্রীর মধ্যেই অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু হাজার বছর কোন দারুকর্মের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব সেহেতু প্রাচীন ও মধ্যযুগের দারুকর্মের নমুনা অনুসন্ধান বড়ই দুঃসাধ্য। ফলে সাহিত্যে বাঙালির জীবন ও তার গার্হস্থ্যের পরিচয় প্রদানকালে রচয়িতা ব্যবহার্য বস্তুর তালিকায়

দারুকর্মের উল্লেখ করেন। আমাদের অনুমান প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাপ্ত প্রকাশিত নিদর্শনগুলো এক্ষেত্রে আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হতে পারে।

আমাদের প্রাচীন বাংলার মানুষের আচার-আচরণ সমাজ, জীবন ব্যবস্থা, শিল্পচিন্তা বা জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয় জানা যাবে একমাত্র সাহিত্যে। কেননা একজন কবি বা সাহিত্যিক তাঁর সমসাময়িক ঘটনা, পরিবেশ, জীবনবোধ দ্বারা পরিচালিত হন। যার ফলে তাঁদের রচনায় উঠে আসে সমাজ, দেশ তথা মানুষের যাপিত জীবনের অব্যক্ত কাহিনি। সেই জন্যই বলা হয়ে থাকে, সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সাহিত্য পড়া তাই আমাদের জন্য অপরিহার্য মনে হল। আমাদের অনুপ্রেরণা ছিল মধ্যযুগের মহাজন কবিগণ সম্বন্ধে, বিশেষজ্ঞের মূল্যবান দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য। অনুপম সেনের কথা উল্লেখ্য। তিনি তাঁর আদি-অন্ত বাঙালী প্রবন্ধে লিখেছেন, "রেনেসাস কবিদের মতই দেহাতীত প্রেমের অনন্য কাব্যরূপ সৃষ্টি করেছিলেন এঁরা। চণ্ডিদাসের 'সখি, বলিতে বিদরে হিয়া/আমার বধুঁয়া আনবাড়ি যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া' অথবা 'আমারো পরাণ যেমতি করিছে/তেমতি হউক সে,' অথবা 'নারীর প্রেম নিকষিত হেম/কাম গন্ধ নাহি তায়' বা বিদ্যাপতির 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু/তবু হিয়ে জুরনো ন গেল' প্রভৃতি চিরায়ত অমর প্রেমের কবিতা চণ্ডিদাসই অসাধারণ ভাষায় লিখেছিলেন; 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। মাঝে মাঝে ভাবতে অবাক লাগে, কী করে এই কবিরা ইউরোপীয় রেনেসাসের মর্মবাণী : মানুষই সবার উপরে, মানুষই সব কিছুর নিয়ন্তা পরিমাপক– এই উপলব্ধিতে বাংলার নিভৃত পল্লীতে বসে উপণিত হয়েছিলেন।" (হক,২০১২ঃ২২)

১২০১-১৭৬০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ব্যাপি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ চিহ্নিত। একখণ্ড নিষ্প্রাণ কাঠের খণ্ড অখ্যাত ছুতার সূত্রধরদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নানা চিত্রকল্প বা মোটিফের মাধ্যমে চারপাশের জগতের রূপম সৌন্দর্য। কত প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া-মমতার উপাখ্যান এর অব্যক্ত কাহিনি জড়িয়ে আছে এই শিল্পের মাধ্যমে। কত বিস্তৃত ছিল আমাদের এই গৌরবময় শিল্পের অধ্যায়। আজ তা কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে, রয়েছে শুধু চিরন্তন এক শিল্পরূপ তা হলো দারুশিল্প। তাছাড়াও ছড়া, প্রবাদ, কবিতা, লোকগাথা, গান বা বিভিন্ন গীতি নানা কাব্যে এই শিল্প মাধ্যমের উল্লেখ পাই, যা থেকে অনায়াসেই অনুমান করা যায় দারুশিল্পের একটি বড় ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যে দারুশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে অনেক নিদর্শনসহ তথ্যসমূহ সুন্দর করে দেখানো আছে। যেমন যুগে যুগে রাজা-বাদশারা, জমিদার এবং সওদাগরেরা এই সমস্ত শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাদের ঘরে ব্যবহার্য খাট, পালঙ্ক, ঘরের দরজা, বাণিজ্যে যাওয়ার জন্য যে ডিঙ্গি তাঁরা ব্যবহার করতেন সবই কারুকার্য খচিত ছিল। এবং তাতে এত সুন্দর শিল্পকর্ম খোদাই করা থাকত যে মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করত।

আমরা একে একে প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্যগুলো পড়তে শুরু করি। প্রথমে চর্যাপদ পড়লাম এবং সেখানে আমরা অনেক তথ্য পেলাম। চর্যায় কৃষিভিত্তিক গ্রাম জীবনের ছবি রয়েছে। নদীতীরে বসতি বলে নৌকা চালনা, নৌকার হাল, লগি, গলুই, পাল, গুন, নোঙর, বৈঠা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এছাড়া গ্রামের পেশাভিত্তিক মানুষ যেমন– মাঝি, তাঁতি, ধুনুরি, হরিণ শিকারি, কাঠুরে, ডালাকুলা তৈরি ইত্যাদির কথা আছে। আবার চুরি, ডাকাতি ও লুণ্ঠনের মত জীবিকার উপায় ছিল। যাদের সম্পদ সোনাদানা ছিল তাদের চোর-ডাকাতের ভয় ছিল। কাঠুরেরা কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র অতি সুচারুভাবে নির্মাণ করত। এরপর আমরা একে একে ভরতনাট্যশাস্ত্র, মঙ্গলকাব্য–মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদ্মাবতী, ইউসুফ–জুলেখা, মৈমনসিংহ গীতিকা, গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস এবং মধ্যযুগের শেষ কবি ভারত চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত এই তালিকায় যুক্ত করলাম।

প্রাচীনকালের বাংলা সাহিত্য নির্বাচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও প্রাপ্ত দারুশিল্পের নিদর্শন

পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ এবং মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভাব, চিন্তা, কর্ম, আদর্শ,উদ্দেশ্য ও লক্ষ আছে। আরো আছে পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ ও রাষ্ট্র। ফলত শুধু প্রাণী হিসাবে আমরা বাঁচতে পারিনা। বিভিন্ন পরিচয়ে আমরা বহু বিচিত্র এবং বিচিত্রতর কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠি। আমরা চাই আমাদের কাজের মধ্যে বেঁচে থাকতে। তাই আমরা শিল্পের মাধ্যমে নানা রূপ ও লাবণ্য অভিসিক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকি। এমনই এক শিল্পিত প্রকাশ ঘটে দারুশিল্পে। অখ্যাত নিভৃত পল্লীর ছুতার সূত্রধরদের হাতের ছোঁয়ায় ব্যঞ্জময় হয়ে ওঠে নানা চিত্রকল্প বা মোটিফের মাধ্যমে চারপাশের জগতের রূপময় সৌন্দয। প্রাচীনকালের নির্বাচিত গ্রন্থের মধ্যে আমরা ভরত-নাট্যশাস্ত্র ও চর্যাপদকেই পেয়েছি।

ভরত-নাট্যশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতের একটি স্মরণীয় গ্রন্থ ভরতনাট্যশাস্ত্র। এই গ্রন্থ শুধু নাটকের নয়–অভিনয়শিল্পী, নৃত্য, সংগীত ও অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কেও একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক রচনা। এর রচয়িতা ছিলেন ভরত মুনি। তিনি একজন প্রাচীন ভারতীয় নাট্য ও সংগীত বিশারদ। ভরতকে ভারতীয় নাট্যধারার জনক বলা হয়ে থাকে। এটি রচনার সঠিক সময় পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়। ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ২০০৯ সালে ভরত নাট্যশাস্ত্র কলিকাতা থেকে নবপত্র প্রকাশন প্রকাশ করে।

ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকৃত ভরত-নাট্যশাস্ত্র বইটিতে প্রেক্ষাগৃহলক্ষণ অধ্যায়ে রঙ্গমঞ্চের বর্ণনায় দেখা যায়–

"রঙ্গপীঠং ততঃ কার্য্যং বিধিদৃষ্টেন কর্মাণা।
রঙ্গশীষং তু কর্ত্তব্যং ষট্দারুক সমন্বিতম্ ॥" (শ্লোক-৬৮) পৃ. ৩১

এখানে ***ষট্দারুক*** শব্দ দ্বারা ছয় খণ্ড কাঠ বুঝিয়েছেন। এরপর ৩২ নং পৃষ্ঠায় ৭৫-৭৮ নং শ্লোকে দেখা যায় রঙ্গমঞ্চে কারুকার্যের ব্যবহার।

"এবং রঙ্গশিরঃ কৃত্বা দারুকর্ম প্রবর্ত্তয়েৎ।
উহপ্রত্যূহসংযুক্তং নানা শিল্প প্রয়োজিতম্ ॥
নানাসঞ্জবনোপেতং বহুব্যালোপশোভিতম্ ।
ভবেয়ুশ্চত্র বিন্যাস্তা বিবিধা ঃ সালভঞ্জিকা ॥
নির্যূ হকুহরপেতং নানাগ্রথিতবেদিকম্।
নানাবিন্যাসসংযুক্তং চিত্রজালগবাক্ষম্ ॥
সুপিঠধারণীযুক্তং কপোতালীসমাকুলম।
নানাকুট্টিমবিন্যস্তৈ ঃ স্তম্ভৈশ্চাপ্যুপশোভিতম্ ॥
(বন্দ্যোপাধ্যায় ও চক্রবর্তী, ২০০৯)

তারপর 'রঙ্গপীঠ' তৈরির নিয়মে দেখা যায়, "রঙ্গপীঠ আদর্শতলবৎ করাই নিয়ম–কুর্মপৃষ্ঠের মত অথবা মৎস্যপৃষ্ঠাকার হইবে না। রঙ্গপীঠের উপর দিকে–মাথায় কতগুলি রত্ন বসাইতে হয়। যেখানে বসাইতে হয় সেই স্থানের নাম 'রঙ্গশির'। ইহার পূর্বদিকে হীরক, দক্ষিণে বৈদুর্য্য, পশ্চিমে স্ফটিক, উত্তরে প্রবাল, মধ্যে কনক দিতে হয়। এই রকম করিয়া রঙ্গশির তৈরী করিয়া তবে তাহাতে কাঠের কাজ করিতে হয়। কাঠের কাজকে 'দারুকর্ম' বলা হইত। কাঠে নানারকম শিল্প-রচনা করিতে হইত। সিংহ–ব্যাঘ্রাদি জন্তু, অট্টালিকা, নানারকম পুতুল, বেদি, যন্ত্রজালগবাক্ষ, কুট্টিমের উপর স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া কাঠের কাজ শেষ করা হইত" (বন্দ্যোপাধ্যায় ও চক্রবর্তী, ২০০৯, ২৫১, ২৫২)

তারপর 'চতুরঙ্গ মণ্ডপ' নির্মাণের নিয়মে দেখা যায়, এখানেও রঙ্গপীঠের মত আরো দশটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হতো। এই স্তম্ভগুলো শাল কাঠের তৈরি ছিল। আর সেগুলো স্ত্রীমূর্তিরূপ খোদাই করে অলংকৃত করা ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই দারুকর্মগুলো নিছক সূত্রধর বা ছুতারদের কর্ম নয়, এরা দারুশিল্পী ছিলেন। এবং খুবই উঁচুমানের শিল্পী ছিলেন। কাজের প্রতি তাঁদের একাগ্রতা, ধ্যান–জ্ঞান ও আন্তরিকতার অভাব ছিলনা।

চর্যাপদ

চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম পদ সংকলন তথা সাহিত্য নিদর্শন। খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এই গীতিপদাবলির রচয়িতারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ় অর্থ সাংকেতিক রূপের আশ্রয়ে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই তাঁরা পদগুলো রচনা করেছিলেন। সে বিবেচনায় এটি একটি ধর্মগ্রন্থজাতীয় রচনা। একই সঙ্গে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলি এই পদগুলোতে উজ্জ্বল। এর সাহিত্যগুণও চিত্তাকর্ষক। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে ‘চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়’ নামক একখানা প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থখানিই পরবর্তীকালে চর্যাগীতিকা বা চর্যাপদ নামে পরিচিত হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চর্যাপদের সঙ্গে বাংলা ভাষার অনস্বীকার্য যোগসূত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করেন। চর্যাপদের প্রধান কবিগণ হলেন লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, শবরপাদ প্রমুখ।

চর্যায় নদী ও নৌকা সংক্রান্ত রূপকের সংখ্যাধিক্য নদীমাতৃক বাংলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাঁকো, কেড়ুয়াল, গুনটানা, দাঁড়টানা, পালতোলা, সেঁউতি, কাছি, খুন্টী, উজান বাওয়া বার বার চর্যায় উল্লেখ হয়েছে। ৩৮তম পদে দেখা যায়–

কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ু আল।
সদগুরু বঅণেক ধর পতবাল।।

অর্থাৎ কাঅ–কায়, দেহ। ণাবড়ি–ছোট নৌকাখানি। সদগুরু-বচনে পতবাল (পাল) ধর। (অনুঃসুকুমার সেন)

তাহলে দেখা যাচ্ছে দারুশিল্পের ব্যবহার বা কাষ্ঠশিল্পের উল্লেখ পাই আমাদের সর্বপ্রাচীন কাব্যগ্রন্থ চর্যাপদে। চর্যায় কৃষিভিত্তিক গ্রাম জীবনের ছবি রয়েছে। নদীতীরে বসতি বলে নৌকা চালনা, নৌকার হাল, লগি, গলুই, পাল, গুন, নোঙর, বৈঠা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের মধ্যে কাঠুরেরাও ছিল। তারা কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র অতি সুচারুভাবেই নির্মাণ করত।

চর্যা-৮
“সোনে ভরলীকরুনা নাবী।” এখানে নাবী মানে নৌকা। আবার
“মাঙ্গত চড়হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ু আল নাহি যে কি বাহবকে পারঅ ”

এখানে মাঙ্গত মানে নৌকার সামনের ও পিছনের অংশ গলুই। নদীমাতৃক বাংলাদেশে একমাত্র নৌকাই ছিল তখনকার যানবাহন। সেটাতে করে এক জায়গা থেকে অন্য

জায়গায় আসা–যাওয়া চলত। এ নৌকাগুলো কাঠের তৈরি ছিল। (সাঈদ, ২০১২, পৃ. ৬১)

চর্যা-১০

"অইসমি জাসি ডোম্বী কাহারি নাবে।" এখানে নাবে শব্দটির অর্থ হলো নৌকা। এখানে ডোম্বীকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে, আস যাও ডোম্বী কার নৌকায়। (সাঈদ, ২০১২ পৃ. ৬৮)

চর্যা-১৪

"গঙ্গা জউণা মাঝে রে বহই নাঈ।" এখানে নাঈ শব্দের অর্থ নৌকা। (সাঈদ, ২০১২ পৃ. ৮৬)

চর্যা-২৮

"তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সে জি ছাইলী।"

(সাঈদ, ২০১২ পৃ. ১৩২)

এখানে তিন ধাতু দিয়ে তৈরি খাটের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে, তার মানে সোনা-রুপা, তামা-কাসা, লোহা এই তিন ধাতু দিয়ে খাট তৈরি হয়েছে যদি ধরি, তাহলে তা সেটা সম্ভব নয়। কেননা, সোনা-রুপা অতি নরম ধাতু। আবার লোহার সাথে সোনা–রুপার মিলন সম্ভব নয় এই তিন ধাতুর চারিত্রিক বৈশিষ্টের কারণেই। তাই অনায়াসেই বলা যায়, কাঠের তৈরি খাটের মধ্যে সোনা-রুপার পাত বসিয়ে নকশা করা হত। সেই সময় ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি কাঠ দিয়েই তৈরি হতো। যেসময়ে তিন ধাতুর খাট তৈরি হচ্ছে সেইসময়ের অসবাবপত্রে খোদাইকৃত উন্নত শিল্পমানসম্পন্ন কারুকার্য থাকবে এটাই গবেষকের কাছে অনুমেয়। এবং এই কারুকার্যখচিত দারুকর্মগুলোই দারুশিল্পের প্রাচীন নিদর্শন বলে গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

চর্যা-৩৮

" কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ু আল
সদগুরু বঅণেক ধর পতবাল ॥
চিঅ থির করি ধহুরে নাঈ।
আন উপাএঁ পার ণ জাই ॥
নৌবাহী থেকে টানঅ গুনে।" এই চর্যায় ণাবড়ি, নাঈ ও নৌবাহী অর্থ নৌকা।

এখানে এই চর্যায় নৌকাকে দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। (সাঈদ, ২০১২ পৃ. ১৭১)

আমরা যদি চর্যা-৫ এবং চর্যা-৪৫ এর পংক্তিগুলো পর পর খেয়াল করে দেখি তাহলে আমাদের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে সেই সময়ে কেমন দারুশিল্পের কাজ হতো।

চর্যা-৫

"ফারিঅ মোহতরু পটি জড়িয়।

আদআদিঢ়ি টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ ॥”
চর্যা-৪৫
“বর গুরু বঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ।”
(সাঈদ, ২০১২ পৃপৃ. ৩৯, ১৯২)

এখানে ‘ফারিঅ’ মানে ফেরে ফেলা আর ‘জড়িয়’ অর্থ হলো জোড়া দেয়া। মোহতরুকে ফেরে ফেলা হয়েছে, পাটিও জোড়া দেওয়া হয়েছে। এ কথার ইঙ্গিতে মনে হয় কাঠের আসবাবপত্র অতি সুচারুভাবে নির্মাণের কৌশল দারুশিল্পীদের জানা ছিল, কাঠ জোড়া দেবার কৌশলও তাদের জানা ছিল। তাছাড়া পাঁচটি বৈঠার কথা ও বজ্রানৌকার কথা আছে। তাই অনুমান করা যায় যেখানে কাঠুরের পেশা আছে সেখানে কাঠ খোদাইয়ের কাজ হবে না এটা ভাবা যায় না, বরং চমৎকার চমৎকার কাঠের কাজ হবে এটা ভাবাই যুক্তিযুক্ত। আর তাছাড়া যেখানে বজ্রানৌকার কথা আছে সেখানে বাহারি নকশা করা কাঠখণ্ড সেই নৌকায় থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।

প্রাচীনকালে প্রাপ্ত দারুশিল্পের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

আমরা এখানে প্রাচীনকালের দারুশিল্পের যে নিদর্শনগুলো পেলাম তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট যদি আলোচনা করতে যাই তাহলে প্রথমে আমাদের শিল্পের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রক্রিয়া (Tools) সম্বন্ধে জানতে হবে। কোন্ কোন্ মাধ্যম বা কী কী প্রক্রিয়ায় এবং কিভাবে এই দারুশিল্পের স্বরূপ উদঘাটনের মত দুরূহ কাজটি করা হবে তা জানা জরুরি বলে মনে করছি। শিল্পী, শিল্পরসিক বা দর্শক আবার অন্যপক্ষে শিল্পবোদ্ধা বা শিল্পতাত্ত্বিক সবাই শিল্পীসৃষ্ট শিল্প নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন যথার্থ শিল্পের স্বরূপ উদঘাটনের লক্ষ্যে। ভাল শিল্প, মন্দ শিল্প, সার্থক শিল্প, অসার্থক শিল্প, দুর্বল শিল্প, বিশুদ্ধ শিল্প, এই যেমন– ফর্ম, লাইন টেক্‌চার, সৌন্দর্য, পরিপ্রেক্ষিত, অনুপাত, কম্পোজিশন, ঐকতান, ভারসাম্য, ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত এবং সার্থক শিল্পের ব্যাখ্যাদানে এগিয়ে এসেছেন প্লেটো, এরিস্টটল, ক্রোচে, হেগেল, রঁমারঁলা, অস্কারওয়াইল্ড, অবনীন্দ্রনাথসহ বিখ্যাত অগণিত দার্শনিক এবং শিল্পতাত্ত্বিক। “No great artist ever sees things as they realy are. he would cease to be an artist. অর্থাৎ প্রকৃত কোন বড় শিল্পীই প্রকৃতির বিষয়বস্তুকে তার স্বরূপে বা নিজস্বরূপে প্রত্যক্ষ করেননি। যদি তা করতেন তাহলে তার শিল্প প্রতিভার কিংবা শিল্পীসত্তার অবসান ঘটত। শিল্পী এবং শিল্পীর দর্শন বিষয়ে এ অভিমত বিশ্ববিখ্যাত শিল্পতাত্ত্বিক অস্কার ওয়াইল্ড (১৮৫৪-১৯০০) এর। তার এই উক্তির মধ্য দিয়েও প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ বিধৃত হয়েছে।” (সাত্তার, ২০০৩)

ভারতীয় শিল্পের যেসমস্ত প্রাচীন রীতিনীতি প্রচলিত ছিল, সে সকল রীতিনীতিতেও অনুকরণ বিরোধী মতবাদই প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ শিল্পী বাস্তবে দেখা কোন কিছুর

অবিকল চেহারা নির্মাণ করবেন না, বেঁধে দেয়া কোন নিয়ম-নীতির নিগড়ে আবদ্ধ থাকবেন না, বরং স্বাধীনভাবে মুক্তমনে শিল্প সৃষ্টি করবেন, যেমন খুশি তেমনি সৃষ্টি করবেন। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, শিল্পী যা সৃষ্টি করেন তার সঙ্গে পৃথিবী তথা চেনা জগতের বিষয়ের মিল নাও থাকতে পারে, থাকলেও থাকবে সামান্যই। শিল্পীর সৃষ্টি মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, গাছপালা সবই হবে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির চেনা জগতের বা বাস্তবে দেখার সাথে হুবহু মানে অবিকল মিল থাকবে না।

প্রাচীনকালের সাহিত্য বলতে আমরা শুধু চর্যাপদকেই বুঝি। আর এই চর্যায় কৃষিভিত্তিক গ্রাম জীবনের ছবি রয়েছে। নদীতীরে বসতি বলে নৌকা চালনা, নৌকার হাল, লগি, গলুই, পাল, গুন, নোঙর, বৈঠা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। খাট-পালঙ্ক, নৌকা ও বিভিন্ন রকমের আসবাবপত্র– এগুলোই হল প্রাচীনকালের সাহিত্যে প্রাপ্ত দারুশিল্পের নিদর্শন। খাট-পালঙ্ক, নৌকা এবং বিভিন্ন রকমের আসবাবপত্রে দারুশিল্পীরা বিভিন্ন মোটিফ ব্যবহার করে নকশা করেছেন। কিন্তু এই সমস্ত আসবাবপত্রে ঠিক কী ধরনের মোটিফ ব্যবহার করে নকশা খোদাই বা দারুকর্ম করা হয়েছে তার বিস্তারিত উল্লেখ আমরা পাইনা। তবে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন জাদুঘরে রক্ষিত সেই সময়ে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর দিকে তাকালে আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, তারা কি ধরনের মোটিফ ব্যবহার করেছে। আরো আশার বিষয় হল "তিঅ ধাউ খাট পড়িলা" অর্থ তিন ধাতু দিয়ে তৈরি খাট। তিন ধাতু মানে–সোনা, রুপা, কাসা-পিতল দিয়ে যেখানে খাটের নকশা করা হয়ে থাকে সেখানে যে খুব উন্নতমানের দারুকর্ম থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এবং দারুশিল্পীরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী মোটিফ ও উপাদান ব্যবহার করে নান্দনিকতা সৃষ্টি করে শিল্পকর্ম করতে পেরেছেন তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এই আলোকে বিচার করলে প্রাচীনকালে প্রাপ্ত এই নিদর্শনগুলো শিল্পের মর্যাদা পায়। কিন্তু এই শিল্পগুলোর একটা ব্যাবহারিক দিক রয়েছে, সেই বিচারে গেলে প্রাচীনকালের সাহিত্যে প্রাপ্ত দারুশিল্পের এই নিদর্শনগুলো কারুশিল্পের পর্যায় পরে। কারণ নান্দনিক উপস্থাপনাসহ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে যা ব্যবহার হয় তাকে কারুশিল্প বলা হয়। অন্যদিকে *ভরত-নাট্যশাস্ত্রে* প্রাপ্ত নিদর্শন হল 'রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ'। রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের বিভিন্ন অংশে যেমন, রঙ্গপীঠ, রঙ্গশির, চতুরঙ্গ মণ্ডপ ইত্যাদিতে দারুকর্মের কাজ বা দারুনকশা করা হয়। এখানে এই নকশাকার্যে কিছু মোটিফের নাম পাওয়া যায়। যেমন, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি জন্তু, অট্টালিকা, নানারকম পুতুল, বেদি, যন্ত্রজালগবাক্ষ ইত্যাদি। আর স্তম্ভগুলোতে স্ত্রীমূর্তিরূপও খোদাই করা দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে এই মোটিফগুলি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, এগুলো কোন সাধারণ নকশা নয়। শিল্পমানসমৃদ্ধ কাঠ খোদাই কাজ, যাকে ভাস্কর্যও বলা যেতে পারে। এই কাজগুলো দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক উভয় রকমই ছিল। কাঠে সিংহ-ব্যাঘ্র ও নারীমূর্তি খোদাই করে বের করে আনা খুব সহজ কাজ নয়, অত্যন্ত কঠিন কাজ। অতিশয় দক্ষ হাত এবং ড্রইংয়ে এ গভীর জ্ঞান ও

অনুশীলন ছাড়া এই কাজ করা যার-তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আন্তরিকতাপূর্ণ অতিশয় দক্ষ হাতে করা যে কাজ তা নিশ্চয়ই দেখতে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। এখানে শিল্পী তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে স্বাধীন কল্পনাপ্রসূত মোটিফ ব্যবহার করে নান্দনিকতার উদ্দেশ্যেই এই শিল্পকর্মগুলো সম্পন্ন করেছেন। তাহলে নিসন্দেহে বলা যায় এই দারুশিল্পগুলো ঃ চারুশিল্পের পর্যায় পড়ে। কেননা চারুশিল্প হতে হলে যে গুণাবলি বা শর্ত থাকা জরুরি তার সবই আছে এইসব দারুশিল্পকর্মে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নির্বাচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও প্রাপ্ত দারুশিল্পের নিদর্শন

শ্রীকৃষ্ণকির্তন

শ্রীকৃষ্ণকির্তন আদি-মধ্য বাংলার ভাষার প্রাচীনতম আবিস্কৃত নিদর্শন। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোর গ্রামের বাসিন্দা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐ জেলারই বিষ্ণুপুর শহরের কাকিল্যা গ্রামে জনৈক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে প্রথম *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের পুথি আবিষ্কার করেন। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বনবিষ্ণুপুরের মল্লরাজগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রের বংধর। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের রচয়িতা ছিলেন বড়ুচণ্ডীদাস। এটি মূলত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা বিষয়ক একটি আখ্যান কাব্য। বিষ্ণুর অবতাররূপে কৃষ্ণের জন্ম, বড়াইয়ের সহযোগিতায় বৃন্দাবনে রাধাঁর সঙ্গে তাঁর প্রণয় এবং অন্তে বৃন্দাবন ও উভয়কে ত্যাগ করে কৃষ্ণের চিরতরে মথুরায় অভিপ্রয়াণ—এই হল *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের মূল উপজীব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মুলত ধর্মীয় প্রণয় উপাখ্যান, তাই এই কাব্যে ঐভাবে সেই সময়ের সামাজিক, পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়নি। ফলে ঘর, আসবাবপত্রের বর্ণনা উঠে আসেনি। তারপরেও আমরা নৌকা খণ্ডে দেখি দারুকর্মের সামান্য নিদর্শন। যে নৌকা দিয়ে রাধাকে পার করা হয় সেই নৌকার একটা কল্পচিত্র আমরা পাই। যা থেকে অনুমান করা যায় উন্নতমানের দারুশিল্পের কাজ তখনো হতো।

মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য। এই ধারার অপর দুই প্রধান কাব্য *চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল* কাব্যের *তুলনায় মনসামঙ্গল* প্রাচীনতর। এই কাব্যের আদি কবি কানাহরি দত্ত। বিজয়গুপ্ত এই কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। অন্য কবিদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাস পিলাই প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুমিত হয়, *মনসামঙ্গল* কাব্যের উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অথবা বিহার অঞ্চলে। পরে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গেও এই কাব্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে বহু মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কাব্যগুলি 'মনসামঙ্গল' ও পূর্ববঙ্গে প্রায়শই 'পদ্মাপুরাণ' নামে পরিচিত"। *মনসামঙ্গল* কাব্যেও প্রধান দেবতা সর্পদেবী মনসা। মনসা মূলগতভাবে অনার্য দেবী। যদিও মনসা নিম্ন শ্রেণির ভারতের আদিবাসী ও অন্ত্যজ সমাজের সর্পদেবী, তারপরেও কালক্রমে মনসা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দুসমাজেও প্রতিপত্তি অর্জন করে। *মনসামঙ্গল* একটি আখ্যানকাব্য। এই কাব্যের প্রধান আখ্যানটিও আবর্তিত হয়েছে মর্তলোকে মনসার নিজ পূজা প্রচারের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে। কাব্যের মূল উপজীব্য চাঁদ সওদাগরের উপর দেবী মনসার অত্যাচার, চাঁদের পুত্রেরা সর্পাঘাতে মৃত্যু ও পত্রবধূ বেহুলার আত্মত্যাগের উপাখ্যান।

মনসামঙ্গল কাব্যে ছুতার বা সূত্রধরদের পেশা খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং তারা যে খুবই উন্নতমানের কাঠের কাজ জানত তাই নয়, কাঠ ছেদন করা, সিজন করা, কাঠ জোড়া দেওয়ার কৌশলও তাদের জানা ছিল। কাঠ খোদাই করে তারা খুবই উন্নত মানের দারুচিত্রকর্ম রচনা করতে পারত। তার প্রমাণ আমরা পাই *সূত্রধর কর্তৃক মন-পবন বৃক্ষ ছেদন এবং কালিদহের জল পরিমাণাদেশ* ও *সূত্রধর কর্তৃক ডিঙ্গা গঠন* অংশে। পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য এই অংশটুকু হুবহু তুলে দিলাম।

মন-পবন বৃক্ষ ছেদন এবং কালিদহের জল পরিমাণাদেশ

"পয়ার। আগু পাছু নাহি যায় যত সূত্রধরে। অদ্ভুত পুরীতে বৃক্ষ কাটিবারে ৷৷...চারি ক্রোশ বৃক্ষ গোটা আড়ে পরিসর। রাত্রি দিনে কাটি পড়ে ভূমির উপর ৷৷...নামাইল বৃক্ষ গোটা নর্মদার জলে ৷৷ উত্তরার বৃক্ষ ভাসি দক্ষিণেতে যায়। দুই কূলে বসি প্রজাগণ রঙ্গ চায় ৷৷ কত দিনে বৃক্ষগোটা আসিল গুঞ্জরী। টঙ্গিতে থাকিয়া দেখে চাঁদ অধিকারী ৷৷ বহুলোক একত্র করিয়া সদাগর। উঠাইল বৃক্ষ গোটা কুলের উপর ৷৷...মন যে পবন কাঠ, ঝাটে কর পাট পাট, কার্য কৈলে পুত্রের সমান, সূবর্ণ বলয় তাড়, সূত্রধর পরিবার, আর দিল সুবর্ণ টোপের। রাজার প্রসাদ পেয়ে, সূত্রধর চলে ধে'য়ে চিরিবারে লাগিল সত্তর।

সূত্রধর কর্তৃক ডিঙ্গা গঠন

লাচাড়ী, ত্রিপদী, পঠমঞ্জুরী রাগ। ডিঙ্গার পত্তন করে, চন্দ্রধর সদাগরে, মনেতে হইয়া সানন্দিত। চন্ডিকারে দেয় ডালি, মহিষ ছাগল বলি, পূজা করে কুল পুরোহিত ৷৷ সাত ঘটিকা সময়, মাহেন্দ্র যে ক্ষণ হয়, হাতে সাধু লইয়া হাতুরা। চন্ডিকার শ্রীচরণ, শিরেতে করি বন্দন, গঠন করিল ডাঙ্গা দাঁড়া ৷৷ সেই দাঁড়ার উপর মিলি যত সূত্রধর লাগাইল সিন্দুরের ফোঁটা। দু-পাশে লাগায় বাট, দিয়া মন পবন কাঠ, গঠে ডিঙ্গা নাহি টুটা ফাটা ৷৷ মালুম গাছ তুলিল, সোনা রুপা লাগাইল, গুঁড়া লাগাইল সারি সারি। দুপাটি তেপাটি

করি, পাট জোড়ে সারি সারি বাদ্যে কম্পে চম্পক নগরী ৷৷...ডিঙ্গা গঠয়ে ছুতার, উপমা নাহিক তার, দেখিয়া আনন্দ সদাগর ৷৷ ” (চক্রবর্তী, ১৪৪–১৪৭)

অন্যস্থানে (পৃ. ৯২) গৃহের বর্ণনায় দেখা যায়, কত চমৎকার কারুকার্যখচিত সিংহদ্বার, পেখম খুলিয়া ময়ূর যোটক নাচছে, নানা বর্ণের পাখিরা খেলা করছে। এভাবে নানা চিত্র খোদিত আছে, যা দেখে লখিন্দরের মন খুবই পুলকিত হল, হৃদয়-মন ভরে উঠল। অবশ্য এই কাজগুলো দারুকর্ম কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার।

চণ্ডিকামঙ্গল

চণ্ডিমঙ্গল কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য। *চণ্ডিমঙ্গল* দেবী চণ্ডির মহিমা গীত। এই কাব্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি “কবিকঙ্কণ” মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। অন্য কবিদের মধ্যে দ্বিজ মাধব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। *চণ্ডিমঙ্গলের* আখ্যান ভাগ মূলত পারস্পরিক যোগসূত্রহীন দুটি পৃথক কাহিনির সমন্বয়। প্রথম কাহিনি, আখেটিক খণ্ড। ব্যাধ কালকেতু ও তাঁর স্ত্রী ফুল্লরার প্রতি দেবীর অনুগ্রহের কাহিনি। আর দুই, বণিক খণ্ড। বণিক খণ্ডের সূচনায় শিবভক্ত বণিক ধনপতি দেবী পূজায় অস্বীকার করেন। যার ফলে ধনপতি এবং তাঁর পুত্রকে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হয়। আবার সেই দেবীর কৃপায় তারা দুজনেই মুক্তি লাভ করেন। শেষে ধনপতি দেবীর মহিমা স্বীকার করতে বাধ্য হন। এ দুটি কাহিনিই আনুমানক ১১০০ সালের। কবির আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ১৫৯৪-১৬০৩ খ্রিঃ-এর মধ্যে তাঁর কাব্য রচিত হয়। গ্রন্থের ছত্রসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। নিম্নে দারুশিল্পের নিদর্শন তুলে ধরা হল–
চণ্ডিমঙ্গল কাব্যে তৃতীয় দিবস ‘দিবা’ ৭৬ পয়ার ৪৬ পৃষ্ঠায় কাঠের ধনুকের উল্লেখ আছে।

কলিতা কাঠের ধনু
পশুগনে কাল নিত্য পাতে জাল।

আবার একই দিবসে নিশাপালা ১০৯ পয়ার পৃষ্ঠা ৬৬
কাঠ আনিহ এক ভাব
হাল বাকি দিব ধার
মিষ্ট কিছু আনিহ উধার
১১১ নং পয়ার পৃ.৬৭
তরুর পিড়া লম্বিত মূকুতা চুড়া
কিনে দোলা রত্নে ভুষিত

এখানে যে পিঁড়ির বর্ণনা আছে তাতে বোঝা যায় এই পিঁড়িতে খোদাইকৃত নকশা আছে। যেখানে রত্ন, মুক্তাও বসানো আছে, যার কারণে পিঁড়িটা হয়ে উঠেছে দৃষ্টিনন্দন। এটা সেই সময়ের দারুকর্মের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারপর আমরা খাট

পালঙ্কের উল্লেখ দেখি এই কাব্যে। তখনকার সামাজিক, পারিপার্শ্বিক এবং অর্থনীতিক অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, সেই সমস্ত খাট পালঙ্কে দারুনকশা থাকবে এটাই গবেষকের নিকট পরিদৃষ্ট হচ্ছে। যেহেতু সেই সময় ছুতার বা সূত্রধর পেশা ছিল। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি ছুতার বা সূত্রধরেরা উন্নতমানের কারুকার্য জানত এবং তারা তাদের সেই দক্ষতার প্রমাণও রেখেছে সেই সময়ের তৈরি আসবাবপত্রে।

১১৮ পয়ার পৃ.৭২
দেবদারু বিশ্বকর্মা তার পুত্র দারুব্রহ্মা
শিরে ধরে চণ্ডিকার পান
সঙ্গে জাতি বন্ধ নাতি উজ্জাগর দিনবাতি
নানা চিত্র করএ নির্মাণ।

এখানে আমরা স্পষ্টভাবে দারুশিল্পের উল্লেখ দেখতে পাই। কাঠ খোদাইয়ের মাধ্যমে নানা চিত্র নির্মাণের অপূর্ব শিল্প নিদর্শন দেখতে পারছি।

৪র্থ দিবস ঃ নিশাপালা, পয়ার ২০০, পৃ. ১১৯।
উহু ব্যয় করি কড়ি করিলাঙ খাট পাড়ি

এখানেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অনেক টাকা ব্যয় করে যে খাট তৈরি করা হয় তা নিশ্চয় অতি সাধারণের ন্যায় দেখতে হবে না, অবশ্যই সেটা আড়ম্বরপূর্ণ নকশা খোদিত সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এবং এই কাব্যে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়ে কাঠই সহজলভ্য ছিল। এবং সেই কাঠে নানা চিত্র বা নকশা খোদাই করার কাজ তাদের কাছে কোন ব্যাপারই ছিল না। তাই গবেষকের মনে হয়েছে এই খাটটি দারুশিল্পের একটি উত্তম নিদর্শন।

৬ষ্ঠ দিবস দিবা, ৩৩৬ পয়ার, পৃ. ১৯৫ (সেন, ১৯৯৩)

এখানে সপ্তডিঙ্গার কথা বলা হয়েছে যদিও ডিঙ্গাগুলোর নকশার কোন বর্ণনার উল্লেখ নাই। তথাপি এগুলোকে সাধারণ ডিঙ্গা বলা যাবে না। কেননা এই ডিঙ্গাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তাতেই অনুমান করা যায়, এই ডিঙ্গাগুলোতে উচ্চমানসম্পন্ন নকশা খোদিত ছিল। যার কারণে এই ডিঙ্গাগুলো একেকটাই হয়ে উঠেছে দারুশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

চৈতন্যভাগবত

বৃন্দাবন দাস বিরচিত *চৈতন্যভাগবত* বাংলা সাহিত্যে প্রথম গ্রন্থের মর্যাদা লাভের অধিকারী। যদিও মালধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসাবিজয় এবং অনেকের মতে কৃত্তিবাসের রামকাহিনি এর আগে রচিত হয়েছে, তথাপি ওই গ্রন্থগুলোর

প্রাচীন রূপ রক্ষিত হয়নি। আর একটি বিষয়, এই প্রথম বাংলা গ্রন্থ যার নায়ক দেবদেবী নয়, এক সমসাময়িক সুপরিজ্ঞাত মানুষের জীবন কাহিনি এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। *চৈতন্যভাগবত* প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সন্তকবি (১৫০৭-১৫৮৯খ্রিস্টাব্দ) রচিত চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি জীবনীগ্রন্থ। এটি বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যমহাপ্রভুর প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের প্রথম জীবন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তকরূপে তাঁর ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের আদি নাম ছিল চৈতন্যমঙ্গল। কিন্তু পরে জানা যায় যে কবি লোচন দাসও এই নামের একটি চৈতন্যজীবনী রচনা করেছেন। তখন বৈষ্ণব সমাজের গণ্যমান্য পণ্ডিতগণ বৃন্দাবনে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের গ্রন্থটির নাম হবে *চৈতন্যভাগবত*।

বৃন্দাবন দাস বিরচিত *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গায় কাষ্ঠ শব্দের উল্লেখ আছে। একজায়গায় শকট শব্দ পাওয়া যায়। আদি খণ্ডে, অষ্টম অধ্যায়ের ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখা যায়–

"কোনদিন শিশু সঙ্গে নল খড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা পেলেন ভাঙ্গিয়া।।"

শকট শব্দের অর্থ গাড়ি, এই গাড়ি দারুকর্ম দ্বারা তৈরি। তারপর বিভিন্ন জায়গায় নাও, নৌকা শব্দ দেখা যায়, খিয়ারি শব্দ দেখা যায় যার অর্থ মাঝি। মধ্যেখণ্ডের নবম অধ্যায়ে ১৪১ পৃষ্ঠায় দেখা যায়–

"আমি নৌকা নিয়া খিয়ারি রুপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে।।" (সেন, ১৯৯১, পৃ. ১)

এই গ্রন্থ মূলত মানুষের জীবন কাহিনি নির্ভর। কিন্তু আধুনিক বিলাসবহুল মানুষের জীবন নয়। এখানে সুকুমার সেনের কথাটি প্রণিধানযৌগ্য। "বৃন্দবনদাসের গ্রন্থই বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম দীর্ঘ রচনা যাহাতে দেবদেবী নহে, গালগল্প নহে, এক সমসাময়িক সুপরিজ্ঞাত মানুষের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে" (সেন, ১৯৯১, পৃ. ১)। কাজেই এই কাব্যে খাট, পালঙ্ক, বাড়িঘরের তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে অসাধারণ চরিত্রের লীলা অবলম্বনে চিত্র অঙ্কন শুরু হয়। ক্রমে নারীমূর্তি, পাইক বরকন্দাজ, পাখি, বাঘ ও শিয়ালের কাঠময় মূর্তি গড়া হয়। বাংলার সূত্রধরেরা চণ্ডীমণ্ডপ বা আটচালায় ধনী-গৃহের ফটকে, কড়ি-বরগা-স্তম্ভ বা শুঁড়ো নির্মাণে, দরজায় মূর্তি বা লতাপাতা-ফুল অঙ্কন করত। রথে কারিগরি বিদ্যার প্রকাশ দৃষ্ট হত। এই কারিগরদের দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। (ঘোষ, ১৯৭৯)

মৈমনসিংহ গীতিকা

মৈমনসিংহ গীতিকা ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীন পালাগানের সংকলন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেল থেকে স্থানীয় সংগ্রাহকের সহায়তায় প্রচলিত এ পালাগানগুলো সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে *মৈমনসিংহ গীতিকা* (১৯২৩) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি বিষয়মাহাত্ম ও শিল্পগুণে শিক্ষিত মানুষেরও মন জয় করে। মৈমনসিংহ গীতিকায় ১০টি গীতিকা স্থান পেয়েছে, যথা- মহুয়া (দ্বীজ কানাই), মলুয়া, চন্দ্রাবতী (নয়ানচাঁদ ঘোষ), কমলা (দ্বীজ ঈশা), দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও নীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ানা মদিনা
(মনসুর বয়াতি)। এই গীতিকাগুলোতে সামন্ত যুগের সমাজ চেতনার ও মূল্যবোধের ছা য়ালোপাত রয়েছে।

রাজা, জমিদার, দেওয়ান, কাজী, কারকুন, সওদাগর, পীর-দরবেশ, সাধু সন্ন্যাসী, প্রভৃতি চরিত্র মধ্যযুগের মুসলিম শাসন ব্যবস্থাকেই সূচিত করে। সামন্ত সমাজের মূল্যবোধ ধারণ করেও মানবপ্রেমের মহিমা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ইহজাগতিকতা এবং নৈতিকতা *মৈমনসিংহ গীতিকা*কে এমন সাহিত্যিক মূল্য ও মর্যাদা দান করেছে, যা আধুনিক যুগের উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই কাব্যের বিভিন্ন পালায় দারুশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পাই। যেমন–
মহুয়া পালার নিম্নের কয়েকটি লাইন পড়লে দেখতে পাব দারুশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

নদীতে না পড়ল চর উজান বাঁকে পানি।
এইনা আসে সাধুর ডিঙ্গা ভরা বোঝাই খানি ॥
পক্ষী নয় পক্ষী নয়রে উড়াইয়া দিছে পাল
এই সে নৌকায় উঠ্যা যাইবাম যা থাকে কপাল ॥

এই যে পক্ষী নয় পক্ষী নয় বলছে, তার মানে দূর থেকে এই নৌকাগুলো পাখির মত দেখাচ্ছিল। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সরাসরি দারুশিল্পের বা দারুনকশার কথা বলা হয়েছে, কেননা লাইনগুলো পড়লে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সাধুর নৌকা পাখির মত দেখতে ছিল। বোঝা যায় সেই সময়ে সওদাগরদের নৌকাগুলো পাখির আকারে তৈরি হত। নৌকার সামনের অংশ যাকে আমরা গলুই বলি সেই অংশ পাখির মাথা ও ঠোঁটের মত করে তৈরি করত। এই আকারে (Shape) তৈরি নৌকা নিজেই একটা শ্রেষ্ঠ দারুকর্ম। দারু মাধ্যমের শ্রেষ্ঠ মনুমেন্টাল ভাস্কর্য বললেও বেশি বলা হবে না। মনুমেন্টাল ভাস্কর্য বললাম এ কারণে যে ভাস্কর্য হতে হলে খোদাই (Carving), প্রতিমালেপ (Modeling), ত্রিমাত্রিক এবং বিশালত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকতে হয়। এই নৌকাগুলোতে এসবই দেখতে পাওয়া যায়।

পয়ার ১৮ পৃ. ২৮ “সুবর্ণ পালঙ্কে তুমি থাকবা কন্যা বইয়া”

এখানে সুবর্ণ শব্দের অর্থ সোনাও হতে পারে আবার সুন্দর বর্ণও হতে পারে। যেহেতু সোনা একটি নরম ধাতু, এই ধাতু দিয়ে পালঙ্ক তৈরি করলে সেটা ব্যবহার উপযোগী হবে না। তাই আমরা ধরেই নিতে পারি কাঠের তৈরি পালঙ্কে সোনার পাত বসানো ছিল। তাই তাকে সোনার পালঙ্ক বলা হয়েছে।

মলুয়া পালার এই লাইনটি প্রণিধান যোগ্য–

"ঘাটে বান্ধা দৌড়ের নাও পছন্দ বাহার"

এখানে নৌকার নকশা বা সৌন্দর্য দেখে মলুয়ার বাবা হিরাধর খুব পছন্দ করে। নৌকার গায়ে চিত্র বা নকশা খোদিত ছিল বলেই তো হিরাধরের কাছে নৌকা ভালো লেগেছিল। যার কারণে তার মুখ থেকে বের হয়েছে "ঘাটে বান্ধা দৌড়ের নাও পছন্দ বাহার"। পাত্রপক্ষের ধনসম্পদ, অর্থ এবং রুচি বোঝাতেও 'পছন্দ বাহার' শব্দটি বোঝানো হয়েছে।

যখন একজন মানুষ শিল্পকলা দেখে অতি উৎসাহিত হয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নির্মল আনন্দ প্রকাশ করে, তখন সেটা শিল্প হয়ে উঠে। সেদিক থেকে দেখলেও এই নৌকাগুলো উন্নতমানের দারুশিল্পের নিদর্শন।

৮৮ পৃষ্ঠায় ১৬ নং পয়ারে পালঙ্কের কথা বলা হয়েছে।

"পালঙ্কে বসিয়া তুমি করিবে আরাম"

৯১ পৃষ্ঠায় "পঞ্চ ভাইয়ের পান্‌সীখানা দেখিতে সুন্দর"

এখানে যে পান্‌সীর বর্ণনা আছে তাতে নকশা খোদাই করা আছে। সাধারণ ডিঙ্গি নৌকা দেখে কেউ এরকম মন্তব্য করে না। পানসী বলতে আমরা যা বুঝি বা আমাদের চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে তা হল একটা বড় নৌকা যার উপর দুই বা ততোধিক কোঠাওয়ালা ঘর তৈরি করা থাকে। সেখানে অনেক নকশাদার কাঠের কাজ থাকে যেমন– দরজা, ভেলকি, দাঁড় এবং গলুইতে চোখ আঁকা থাকে। অনেক সময় গলুই দেখতে পাখির ঠোঁটের মত হয়। আরও একটা নৌকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা হলো স্তম্ভ। যার সাথে পাল জুড়ে দেওয়া হয়। সেই স্তম্ভের গায়ে খোদাইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন মোটিফ ব্যবহার করে দৃষ্টিনন্দন নকশা করা থাকে। অনুমান করা যায় সেই রকম একটা পানসী দেখে কাব্যকার 'সুন্দর' শব্দটি ব্যবহার করেছে।

রূপবতী খণ্ডে ২৩৯ ও ২৬০ পৃষ্ঠায় 'বারবাংলার ঘর' অর্থাৎ বারদুয়ারী ঘরের কথা বলা হয়েছে, পানসীর বর্ণনা আছে। ২৪৪ ও ২৪৯ পৃষ্ঠায় পালঙ্কের বর্ণনা আছে। সাধারণত বাংলাঘরগুলো মনোমুগ্ধকর হয়। কেননা সেখানে বিভিন্ন জায়গায় নকশাদার কাঠের কাজ করা থাকত।

কাজল রেখা খণ্ড –

"উত্তম কাঁঠালের পিড়ি ঘরেতে পাতিল"

এখানে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ির বর্ণনা আছে। এটি একটি দারুশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। অন্য স্থানে

"সুবর্ণ মন্দিরে আছে সোনার খাট পালঙ্ক।"

এখানে নিশ্চিত করেই বলা আছে সোনার পালঙ্কের কথা, ডিঙ্গার কথা। আবার কোথাও কোথাও 'খাট-পালঙ্ক' শব্দটি লেখা আছে। কিন্তু সেগুলো কাঠের না অন্য কোন ধাতুর তা নিয়ে অনেকে মতবিরোধ করতে পারেন, তা সত্তেও বলা যায় যে সেগুলো কাঠের। কেননা সোনার পালঙ্ক ব্যবহার উপযোগী নয়, তাই খাট-পালঙ্ক কাঠেরই হয়। যেখানে মশারি টানানোর জন্য খাটের চার কোনায় চারটি কারুকার্যখচিত স্তম্ভ থাকত। তার উপর নকশা করা সোনা, রুপা, পিতল-কাসার পাত বসানো থাকত।

"জলটুঙ্গী ঘর আছে আমার বাপের বাড়ী।
খাট পালঙ্ক আছে কত চান্দুয়া মশারী ॥"

দেওয়ানা মদিনা বা্া আলাল ও দুলাল খণ্ডে বার ডিঙ্গার কথা আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে মনে হয় ডিঙ্গাগুলো কাঠেরই তৈরি। (সেন, ১৯৯৭)

ইউসুফ জোলেখা

ইউসুফ-জোলেখা মধ্যযুগের পুথি লেখকদের রচিত বাংলা সাহিত্যের বহুল আলোচিত অমর প্রেমকাহিনি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৩-১৪০৯ খ্রিস্টাব্দ) *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্য রচনা করেন। শাহ মুহম্মদ সগীর ছাড়াও মধ্যযুগের আরো অনেক কবি *ইউসুফ-জোলেখা* নাম দিয়ে কাব্য রচনা করেন। তার মধ্যে আব্দুল হাকিম, শাহ গরিবুল্লাহ, গোলাম সফাতুল্লাহ, সাদেক এবং ফকির মোহাম্মদ উল্লেখযোগ্য। ছোটবেলা থেকেই এই কাহিনি শুনে শুনে বড় হয়েছি। এই কাহিনি নিয়ে অনেক লোকশ্রুতিও আছে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত ইমাম গাজ্জালীর তফসির থেকে জানা যায়, "জুলেখা ইউসুফের জন্য একটা চতুষ্কোণ ঘর নির্মাণ করেছিলেন। উহার চারটি খাম্বার মধ্য একখানা খাম্বা ছিল কাঠের। সেই ঘরে একটা মুল্যবান কাঠের পালঙ্ক ছিল। উহার প্রতি কোণে রৌপ্যনির্মিত এক মৃগ শাবক এবং স্বর্ণনির্মিত দুইটি করে দাস (গোলাম); তাদের একজনের হাতে স্বর্ণনির্মিত প্রদীপ ছিল। গৃহের দরজাগুলি আবলুস কাঠের এবং হস্তিদন্ত নির্মিত।" (হক, ১৯৯৯, পৃ. ৫৪) শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত কাব্যে টঙ্গি নির্মাণ পয়ার ছন্দে সপ্ত দরজা সংবলিত যে প্রকোষ্ঠের উল্লেখ আছে তাতে অনুমান করা যায়, সেই দরজাগুলো কাঠের তৈরি এবং তাতে বিভিন্ন মোটিফ সংবলিত নকশা বা চিত্র খোদিত ছিল। এছড়াও ঘরের ভিতর কামোদ্দীপক নানা চিত্র খোদিত ছিল। মোটিফ হিসাবে ছিল নানা পশুপাখি, জীবজন্তু, এবং জোলেখার মূর্তি। এছাড়াও

বিভিন্ন জায়গায় পালঙ্ক ও সিংহাসনের উল্লেখ আছে। এবং সেই পালঙ্কগুলি আভিজাত্যপূর্ণ নকশা সংবলিত ছিল।

আর একটা জায়গায় দেখা যায় পৃ. ১৭২

"পোতলা নাচএ কৃত সূতের সঞ্চার" (সগীর, ১৯৯৯)

পদ্মাবতী

পদ্মাবতী মধ্যযুগের বাঙালি কবি আলাওলের একটি কাব্য। এটিকে আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে গণ্য করা হয়। বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন এই অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মাবতী'। মালিক মুহম্মদ জায়সী এর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ এটি। জায়সী তাঁর কাব্য রচনা করেন ১৫২৬-১৫৩০ (খ্রিস্টাব্দ) এই সময়ের মধ্যে। "আনুমানিক প্রায় ১০০ বছরের বেশী সময় পর আরাকানের বৌদ্ধ রাজার অমাত্য মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে *পদ্মাবতী* রচনা করেন" (https://bn.wikipedia.org/wiki/পদ্মাবতী) পদ্মাবতী মৌলিক না হলেও সাবলীল ভাষার ব্যবহার ও মার্জিত ছন্দের নিপুণ প্রয়োগে তা আলাওলের কবি প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

পদ্মাবতী মূলত রাজকাহিনি। রাজ রাজড়াদের প্রেম নিয়ে রচিত কাব্য। এখানকার জীবনে রাজকীয় বিলাস বাহুল্যই প্রধান। কারুকার্য খচিত সিংহাসন, সুসজ্জিত বসার ঘর, শয়নকক্ষে সুদৃশ্য পালঙ্ক, খাটের স্তম্ভগুলো মানব-মানবীর আকৃতিবিশিষ্ট পুতুল দিয়ে অলংকৃত।

জস বন রেংগি চলৈ গজ-ঠাটী।
বোহিত চলে সমুঁদ গা পাটী।।
আবহিঁ বোহিত মন উপরাহীঁ।
সহস কোস এক পল মহঁ জাহীঁ।।

এখানে 'বোহিত' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ নৌকা, এখানে নৌকার কথা আছে। রাজা গজপতি রত্নসিং কে সিংহলে যাবার জন্য নৌকা দিলেন। (জায়সী ২০০৯, পৃ. ৭৫)

আলাওল অনূদিত পদ্মাবতীর দ্বিতীয় খণ্ডে দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন– "নৌশক্তিতে আরাকানরাজ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। আলাওল বহু বিচিত্র নৌবিহারের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি যেমন দ্রুতগামী তেমনি সুসজ্জিত আর শত্রুনিধনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।" (বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০০২, পৃ. ১)

২৩২ পৃ *রত্নসেন বিদায়* খণ্ডে, ২৩৫-২৩৭ পৃষ্ঠায় *দেশ যাত্রা* খণ্ডে, ২৪০পৃ *পদ্মা-সমুদ্র* খণ্ডে ও ২৪৭ পৃষ্ঠায় *যমক* খণ্ডে ডিঙ্গার উল্লেখ আছে। এখানে যে ডিঙ্গার বা নৌকার কথা বলা হয়েছে সে নৌকা বা ডিঙ্গাগুলো কোন সাধারন নৌকা বা ডিঙ্গা ছিল না। এগুলো রাজাদের নৌকা। এই নৌকাগুলো খুবই সুসজ্জিত ও কারুকার্যখচিত ছিল। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৯)

এছাড়াও বিভিন্ন খণ্ডে যেমন, ২৯৩, ২৯৪ ও ২৯৯৭ পৃষ্ঠায় *চিতোর গঢ় বর্ণন* খণ্ডে দারুকর্মের বর্ণনা আছে।

"চিত্র ক মূরতি বিনরহিঁ ঠাঢ়ী।"
"খঁড খঁড সাজ পলঁগু ঔ পীঢ়ী"

"কনকছত্র সিংঘাসন সাজা।"
"জানহুঁ কাঠ নচাৱৈ কোঈ"

প্রবেশপথে সাত বাঁকে সাতটি দেউড়ী। এগুলো প্রত্যেকটি সিংহদ্বার নামে পরিচিত। প্রত্যেক দরজার গায়ে মনোরম চিত্র ও নকশা খোদাই করা ছিল। এই খণ্ডে পালঙ্ক ও স্বর্ণখচিত সিংহাসনের উল্লেখ আছে। (বন্দ্যোপাধ্যায় : ২০০২)

অন্নদামঙ্গল

অন্নদামঙ্গল কাব্য রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত একটি মঙ্গলকাব্য। ভারতচন্দ্র ছিলেন আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবি এবং তাঁর *অন্নদামঙ্গল* এ সময়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এই কাব্য রচিত হয়। এবং যতদূর জানা যায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই এই কাব্য লিখিত হয়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় *অন্নদামঙ্গল* গ্রামীণ পটভূমি বা পরিবেশে রচিত হয়নি; এই কাব্য একান্তই রাজসভার কাব্য। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক অন্নপূর্ণা পুজা উপলক্ষে মহারাজের নিজ কীর্তি এবং তাঁর পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের রাজ্য ও রাজা উপাধি লাভের কাহিনি বর্ণনাই ছিল কবির প্রধান উদ্দেশ্য। দেবী অন্নদা (অন্নপূর্ণা) কীভাবে ভবানন্দ মজুমদারকে কৃপা করলেন, এবং ভবানন্দ কীভাবে জাহাঙ্গীরের দ্বারা অন্নপূর্ণা পূজা করিয়ে রাজত্ব ও রাজা খেতাব লাভ করলেন–এর বর্ণনাই ছিল কবির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য।

অন্নদামঙ্গল থেকে তৎকালীন বাঙালি সমাজের অনেক তথ্যই পাওয়া যায়। দেবী ও ঈশ্বরী পাটনীর ঘটনা থেকে দেব-মানুষের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা যায়। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' দেবীর নিকট পাটনীর এই বর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেই সময়ের আর্থসামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তা অতি সহজে অনুমান করা যায়। এই কাব্যগ্রন্থ যখন রচিত হয়েছে সেই সময়ের কথা আমাদের ভাবতে হবে। তখনকার বাংলার মানুষের জীবনমান, রুচিবোধ বা শিল্পবোধ কতটা উন্নত ছিল তা খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে দারুকর্মের বা দারুশিল্পের মান কেমন ছিল। রাজা-মহারাজাদের ঘরে খুবই উন্নতমানের কারুকার্যখচিত খাট-পালঙ্কের নিদর্শন দেখতে পাই। যেমন, অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৩ পৃষ্ঠায় ***গড়বর্ণন*** পয়ারে দেখা যায়–

" রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত "

আবার ২৬০ পৃষ্ঠায় *বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ* পয়ারেও পালঙ্কের উল্লেখ আছে–

"পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী"

তারপর রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হত সেখানে বাহন হিসাবে রথ ব্যবহার করেছে, নৌকা ব্যবহার করেছে। সেই রথ বা নৌকা কাঠের তৈরি ছিল। এবং সেখানে কাঠের গায়ে সুন্দর সুন্দর নকশা খোদাই করা থাকত।

৪৬ পৃষ্ঠায় *শিববিবাহের মন্ত্রাণা* তে বীণার উল্লেখ আছে।
২০২ পৃষ্ঠায় *অন্নদার ভবানন্দবনে যাত্রা* পয়ারে দেখা যায়–

" কাঠের সেঁউতি মোর হৈলা অষ্টাপদ "

৩০৮ পৃষ্ঠায় দখো যায়-

"বদন চুম্বন করি তলে দিল হাত।
খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিড়িল "।।
(বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ)

এভাবে দেখা যায় অনেক শব্দ আছে যা থেকে মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় যে, সেই সময়ে দারুশিল্পীরা তাঁদের সর্বোচ্চ শিল্পজ্ঞান দ্বারা খুবই উন্নতমানের দারুকর্ম বা দারুশিল্প করেছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় দরজা, খাট-পালঙ্কের নকশায় জীবজন্তু ও মানবমূর্তির মোটিফের ব্যবহার দেখে।

গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

মধ্যযুগের এক শ্রেণির কাহিনিকাব্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেগুলোর আখ্যানভাগে আছে নাথ উপাধিধারী যোগী বা যুগী সম্প্রদায়ের গুরুদের জীবনালেখ্য এবং জীবন দর্শন। এই কাব্যগুলোকে মঙ্গলকাব্যের মতই ধর্মের পটভূমিকায় রচিত আখ্যান কাব্য বলা যায়। পার্থক্য শুধু এই যে, মঙ্গলকাব্যে যেখানে আছেন দেবদেবী, এখানে তাঁদের পরিবর্তে স্থান গ্রহণ করেছেন মীননাথ, গোর্খনাথ, হাড়িপা, ময়নামতি প্রমুখ বিচিত্র চরিত্র। এরা সবাই ছিলেন সিদ্ধাচার্য। মানব-মানবী হয়েও দেবদেবীদের চেয়েও এঁদের ক্ষমতা কম নয়। মঙ্গলকাব্যে যেমন, নাথ সাহিত্যেও তেমনি এই সব মূল চরিত্র অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং এরা অতিমানবীয় অন্ধ শক্তির প্রতীক। এরই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই কবি শুকুর মাহ্‌মুদ বিরচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস কাব্যগ্রন্থে। গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস ১১১২ সাল অর্থাৎ ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। পরবর্তীকালে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী কর্তৃক ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়।

এই কাব্যগ্রন্থে রাজা রাজদরবার ও সিদ্ধপুরুষদের যাপিত জীবন এবং তাঁদের সামাজিক, অর্থনীতিক জীবনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ফলে তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার্য সামগ্রী, বাড়ি-ঘড় ইত্যাদি বিষয়েও জানা হয়ে যায়। যার ফলে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত অনুসন্ধান অর্থাৎ দারুশিল্পের নিদর্শন সে বিষয়ে যৎসামান্য হলেও পাওয়া গিয়াছে। যেমন, পৃ ৩৪ দেখা যায়–

"গুরুর চরনে যে জন মন নাহি বান্ধে।
পার হৈতে নৌকা নাহি মাথ হাতে কান্দে"।

এখানে নৌকার কথা আছে। তার মানে সে সময় নৌকার প্রচলন ছিল। আবার পৃ. ৩৫ এ দেখা যায়–

"শুনিয়া গুরুর কথা বিজয় গমন।
তুরীতে করিল গিয়া রথের সাজন ॥
গঙ্গার জল দিয়া রথেক স্নান করাইল।
হীরামন মানিক দিয়া রথ সাজাতে লাগিল ॥
হীরা দিয়া বান্ধিল রথের বত্রিশ চাকা।
রথেত তুলিয়া বান্ধে ধবল পতাকা ॥
চুরাতে বান্ধিল রথের হাড়িয়া চামর।
মকরন্দ লোভে তাথে বেড়িল ভ্রমর ॥
নানান প্রকারে রথ করাইল সাজন।
রাজহংস বহে রথ সারথি পবন ॥
নানান প্রকারে রথ উত্তম সাজিল।
প্রনাম করিয়া গুরুর সাক্ষাতে রহিল " ॥

এখানে যে রথের কথা বলা হয়েছে তা কাঠের তৈরি ছিল। এই রথ সাজানোর যে বর্ণনা আমরা পাই তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, দারুশিল্পের কী উত্তম কাজ হতো সেসময়।

" খাকের খুটি নৌকার টাটি আবের বেড়া।
পবণে গুণ টানে নৌকার আতসের মোড়া " ॥ পৃ. ৮০

এখানে যে নৌকার কথা আছে সেগুলো অতি সাধারণ নৌকা নয়। "খাকের খুটি নৌকার টাটি আবের বেড়া"। এখানে যে উপমাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখলে অনায়াসে বলা যায় নৌকাগুলো কারুকার্যখচিত ছিল। এবং দেখতে খুবই মনোমুগ্ধকর ছিল। আর তাছাড়া এই নৌকাগুলো রাজাদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

"বসিয়া ছিল গুফিচন্দ্র সুবর্ণ পালঙ্কে।" (যাকারিয়া, ১৯৭৪পৃ. ৯০)

এখানে যে পালঙ্কের কথা এসেছে সেটা রাজার ব্যবহারের জন্য পালঙ্ক, 'সুবর্ণ' পালঙ্ক বলা হয়েছে কোন সাধারণ পালঙ্ক নয়। সেই পালঙ্ক কেমন আলংকারিক, কারুকার্যখচিত তা অতি সহজেই অনুমেয়।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (তৃতীয় খণ্ড)

পূর্ববাংলার লোকসাহিত্যের একটি সংকলন এই গ্রন্থ। মুখে মুখে রচিত ও লোকসমাজে প্রচলিত এর পালাগুলো বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। পালাগুলোর অধিকাংশই চৌদ্দ শতকে রচিত। তবে কিছু পালা ষোল ও সতের শতকেও রচিত হয়েছে। পালাগুলোর রচয়িতারা ছিলেন পল্লীর স্বশিক্ষিত ও অর্ধ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন সাধারণ মানুষ, যারা পেশায় ছিলেন বেশিরভাগই কৃষক ও পাটনী প্রভৃতি নিম্নবৃত্তির। প্রণয়ঘটিত উপাখ্যান, জমিদারদের দলাদলি বা লোকজীবনের কোন ঘটনা নিয়ে ছড়া-পাঁচালির ঢঙে মুখে মুখে এগুলো রচিত হত। পরে গায়েনের দল সুরারোপ করে এইগুলো গ্রামে গ্রামে

গেয়ে বেড়াত। গীতিকার পালাসমূহে বাঙালি জীবনের সহজ-সরল বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।

লীলা কন্যা-কবি কঙ্ক পালা

"সদাগরের ডিঙ্গা যায় সেই নদীপথে"

এখানে ডিঙ্গা বলতে প্রাচীন বাংলার বড় সদাগরি নৌকা। পৃ. ৬৫।

ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা

"কালাধর ডিঙ্গা সাজিল দেখিতে সৌন্দর
ছুয়ান ধরিল গিয়া মাঝি গৌরলধর" পৃ. ১১০।
"পালঙ্কে বসাই তার খানাপিনা দিল।
নানান্ রকমে সাধুর যত্তন করিল" পৃ. ১২০।
"সোনার পালঙ্কে তুমি শুইবা সোন্দরী।।" পৃ ১৪৪।
"এত বলি টোনা বারুই কি কাম করিল।
তার লাগি সারিন্দা এক বানাইতে লাগিল
বৈলাম কাঠের সারিন্দা সে মন-পবনার বইলা।
দাড়াইছ সাপের রগ দিয়া তার বানাইলা
ধলা ঘোড়ার ফালের ছড়ু নোয়াছা গাছের লাসা।
সারিন্দা তৈয়ার হইল দেইখ্তে বড়ো খাসা" পৃ. ১৫৪।

মন-পবনা একধরনের গাছ বিশেষ, কিন্তু 'মন ও পবন' শব্দ প্রথমত মন এবং বাতাসের মত দ্রুত অর্থে ব্যবহৃত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই 'মন-পবন' শব্দটি নৌকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার 'বৈলাম্' শব্দটির অর্থ একধরনের গাছ, যা চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জেলার পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যেত। অর্থাৎ বৈলাম কাঠের সারিন্দাতে 'বইলা' (বাদ্যযন্ত্রের তার কষিবার কান) তৈরি করা হয়েছে মন-পবনা গাছ দিয়ে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ঐ সময়ের দারুশিল্পীরা কাঠ দিয়ে নৌকা বা আসবাবপত্রই শুধু তৈরি করতেন না, এ ধরনের সারিন্দার মত বাদ্যযন্ত্রও তৈরি করতেন। এবং কাঠ কিভাবে জোড়া দেওয়া হয় তাও তাঁরা জানতেন। 'লাসা' শব্দটির অর্থ আঠা, এই আঠা দিয়ে দারুশিল্পীরা কাঠ জোড়া দিয়ে বিভিন্ন ধরনের দারুকর্ম সম্পাদন করতেন।

গৌরলধর মাঝি আসি হুকুম ভালা দিল।
চৌদ্দ কাহন ডিঙ্গা ঘাটে সাজিতে লাগিল ॥
পর্থমে সাজায় রে ডিঙ্গা নামেতে 'ফোরকান'।
ছায়াত্ করি তুলি লইল কেতাব আর কোরাণ ॥
দুতীয়ে সাজায় রে ডিঙ্গা নামে 'কালাধর'।
সেই ডিঙ্গাতে সোয়ার হইল আমির সদাইগর ॥
তারপর সাজায় ডিঙ্গা নামেতে 'কৈল্যান'।
সেই ডিঙ্গাতে তুলি লইল বন্দুক আর কামান ॥

চতুর্থে সাজায় ডিঙ্গা নামে ‘কাঞ্চনমালা’।
সেই ডিঙ্গাতে তুলি লইল বারুদ আর গোলা ॥
তারপরেতে সাজায় ডিঙ্গা নামে গুণধর।
সেই ডিঙ্গাতে উডিল যত লোক আর লস্কর ॥
তারপরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে ‘হংসমালা’।
সেই ডিঙ্গাতে সোয়ার হইল যত লাঠিয়াল ॥
তারপরে সাজিল ডিঙ্গা ‘শ্যমল সোন্দর’।
পচিশমা সেপাই উডিল তাহার উপর ॥
‘হাঙ্কারা’ নামেতে এক সাজাইয়া ডিঙ্গা।
ঢাক ঢোল তুলি লইল বড়ো বড়ো শিঙ্গা ॥
নবমে সাজায় ডিঙ্গা নামে ‘খৈয়াপটি’।
সেই ডিঙ্গাতে তুলি লইল কেঁডা বাইর্‌গার লাঠি ॥
তারপর সাজায় ডিঙ্গা নামে ‘রঙ্গশালা’।
ঢাল কিরিচ লইল তাতে বাছি ভালা ভালা ॥
‘হক্‌চুর’ নামে এক ডিঙ্গা সাজাইল।
ছয়মাসের নানান খানা তাহার উপর লইল ॥
তারপর সাজায় ডিঙ্গা নামে ‘আউল কাউল’।
সেই ডিঙ্গাতে তুলি লইল ভালা চিকন চাউল ॥
তারপরে সাজায় ডিঙ্গা নামে ‘হুডু মুর্‌’।
মিঠা জল তুলিয়া রে ডিঙ্গা কইর্‌ল পূর ॥
শেষেতে সাজাইল ডিঙ্গা নামে ‘লক্ষীধর’।
তার উপরে সোয়ার হইল মাঝি গৌরলধর ॥ পৃপৃ. ১৬৪-৬৫।

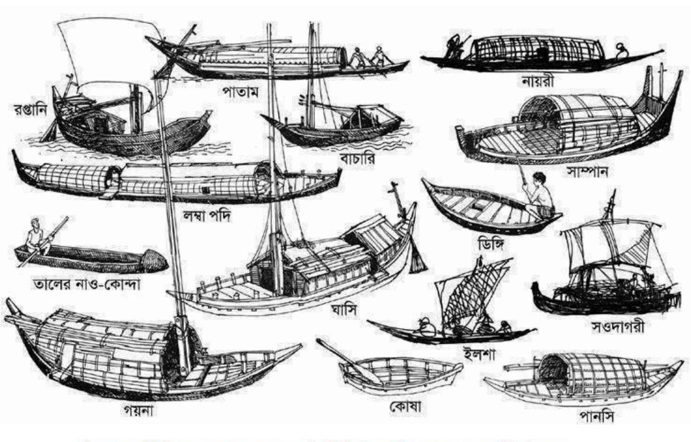

কাফেন চোরা পালা

'পাঁচ খানি সরেঙ্গা নাও ঘাটে বান্ধা তার।' পৃ. ২৭০
'সরেঙ্গা নাও' অর্থাৎ চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও দক্ষিণ আসামে প্রস্তুত রড় নৌকা।

সুনাই সুন্দরী
আষাঢ় মাসে দিঘ্‌লা পানসী রে
পানসী নয়া জলে বাসে। পৃ. ৩০০

'দিঘ্‌লা পানসী' একধরনের দীর্ঘ সুসজ্জিত নৌকা। এই রকম অনেক শব্দ পাওয়া যাবে এই সুনাই সুন্দরী পালায়। যেমন– ৩২৫, পৃষ্ঠায় দেখা যায়,

'ভাওলিয়া সাজাইয়া গেল দেওয়ানের দরবারে' এছাড়াও ৩৩০-৩৩২ পৃষ্ঠায় এই 'ভাওলিয়া' শব্দ দেখা যায়।

এখানে 'ভাওলিয়া' মানে একধরনের সুসজ্জিত প্রমোদ নৌকা বা তরণী। যা পূর্ব বঙ্গে ভাওয়াল পরগনায় প্রস্তুত হত। নিঃসন্দেহে বলা যায় এরকম সুসজ্জিত তরণীতে দারুশিল্পীর দারুকর্ম থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা এসব তরণীতে রাজ-রাজারা গমন করিতেন, রাজাদের নৌযানগুলো অবশ্যই কারুকার্যখচিত, আড়ম্বরপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক ছিল। চিত্তাকর্ষক করার জন্য দারুশিল্পীরা কাঠের গায়ে বিভিন্ন মোটিফ ব্যবহার করে খোদাইয়ের মাধ্যমে নানা চিত্র বা নকশা করে থাকবেন।

'বারবাংলার ঘরে সুনাই' পৃ. ৩৩৩

এই ধরনের ঘরও খুব কারুকার্যখচিত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, বিশেষ করে দরজা, ঘরের পালঙ্ক, ভেলকি, রেলিংগুলো কাঠের নকশা খোদিত হত। দেশের জাদুঘরে রক্ষিত আসবাব বা কাঠের সামগ্রী দেখে তা সহজে অনুমান করা যায়।

'আইস্যা দেখে পইড়্যা সুনাই পালঙ্ক উপরে।' পৃ ৩৩৫

ভারইয়া রাজকন্য চম্পাবতী এর পালায় ৩৭৩ পৃষ্ঠায় পালঙ্ক এবং *শীলাদেবীর* পালায় ৪৩৭ পৃষ্ঠায় সোনার পালঙ্ক শব্দ দুইটি পাওয়া যায়।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড)

কমল সদাইগরের পালা
"জাহাজ সুলুপ বড়ো নুকা আর আছে সাম্পান ॥" পৃ. ৯
"ভরা গাঙ্গে চর পইরা
সাধুর নাও তলায় ॥" পৃ. ১৭
"ডিঙ্গা সাজাইতে কালুকা কর আয়োজন।" পৃ. ২৫
"মাঝি মাল্লা তুলিল যাদুরে নুকার মাস্তুলর উপর ॥" পৃ. ৫৫
" চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়ারে চলিল সগলে।" পৃ. ৬৪

'কমল সদাইগরের পালা' এই পালার মত আরো অনেক পালা আছে যা থেকে বোঝা যায় সেই সময়ের সামাজিক, আর্থনীতিক অবস্থা কেমন ছিল। তাতে অনুমান করা যায়, তখন যোগাযোগের একমাত্র পথ ও বাহন ছিল নদী ও নৌকা। তাই দেখা যায় বণিক শ্রেণি বা সওদাগর ও রাজারা নদী ও সাগরপথেই নৌকাযোগে যাতায়াত করত। সেই নৌকা কোন সাধারণ নৌকা ছিলনা, সেগুলোতে কাঠখোদাই এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মোটিফ ব্যবহার করে নকশা করা থাকত। যার কারণে সেই নৌকা দেখতে খুবই সুন্দর, মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক হত। সেই রকম এক ধরনের 'সুলুপ' হচ্ছে জাহাজের চেয়ে আকারে ছোট নৌকা। তার সাথে আছে বড় নৌকা আর সাম্পান, এগুলো প্রত্যেকটি দারুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আন্ধা বন্ধু
"ওরে মন-পবনের নাও।
কোন দেশতনে আইছরে তুমি
কোন দেশে বান্ যাও।
ওরে মন-পবনের নাও" ॥–দিশা পৃ. ৭৬, ৭৭।
'মন-পবন' সম্মন্ধে আগেই বলা হয়েছে।
"সোনার কবাথ রুপার খিল লো।" পৃ ৭৮

এখানে সোনার 'কবাথ' আর রুপার 'খিল' এর কথা এসেছে যা বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ এ দুটো ধাতু খুবই নরম প্রকৃতির। এর দ্বারা শক্ত ও মজবুত দরজা এবং খিল তৈরি কিভাবে সম্ভব কাঠের সাহায্য ছাড়া। এটা হতে পারে কাঠের তৈরি দরজার উপর সোনার পাত নকশা করে বসানো হয়েছে। একইভাবে খিলটাও তৈরি করা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

"সুবর্ণ পালঙ্ক লো কন্যা,
তোমার ফুলের বিছানা"। পৃ. ১২০

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবির পালাতে ১৪৪, ১৪৯, ১৬৮, ১৭৩, ১৮৩, ১৯১-৯২, ৯৪, ৯৬, ৯৯, ২০০ পৃষ্ঠায় 'পালঙ্ক' শব্দটি দেখা যায়।

মধ্যযুগে প্রাপ্ত দারুশিল্পের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

এখন আসি মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রাপ্ত দারুশিল্পের নিদর্শনগুলোর আলোচনায়। মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য-মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, পদ্মাবতী, ইউসুফ-জুলেখা, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং মধ্যযুগের শেষ কবি ভারত চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও শুকুর মাহমুদের গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস।

এসব সাহিত্যে প্রাপ্ত দারুশিল্পের নিদর্শনগুলো হল বিভিন্ন ধরনের কাঠ খোদাই কার্য যেমন-বিভিন্ন নামের নৌকা, ডিঙ্গা, কাঠ খোদাইয়ের মাধ্যমে নানা চিত্র, খাট-পালঙ্ক, কাঠের গাড়ি, পিঁড়ি, কাঠের স্তম্ভ, দরজা, সিংহাসন, রথ, বীণা, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, কাঠের তৈরি ঘর, বেড়া ও কাঠের আসবাবপত্র। এই সমস্ত কাজের ধরনধারণ সম্পর্কে যদিও বিস্তারিত বলা হয়নি তবুও অনুমান করা যায় দারুশিল্পীরা তাদের মনের ইচ্ছানুযায়ী দারুকর্ম করেছে। কিন্তু তা ছিল গৃহস্থমালিকের প্রয়োজন অনুযায়ী আসবাব যেমন– খাট-পালঙ্ক, পিঁড়ি, ধনুক, নৌকা ইত্যাদি যা ঐসময়ের পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনে বেশি ব্যবহার হত তার উপর। কিন্তু কি কি মোটিফ ব্যবহার করে এই নকশা বা খোদাই কাজ করেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ নেই, কিন্তু কোথাও কোথাও তাঁদের দারুকর্মে ব্যবহৃত কিছু মোটিফের নাম পাওয়া যায়, যেমন– মৃগশাবক, মানুষ, প্রদীপ ও তীর-ধনুক। তাছাড়া আমরা ঐ যুগের সমসাময়িক রাজা, জমিদার ও অমাত্যবর্গের ব্যবহার্য আসবাবপত্রের দিকে যদি তাকাই যা আজকের দিনে জাদুঘরগুলোতে সংরক্ষণ করা আছে যেমন, ময়মনসিংহ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে মুক্তাগাছার জমিদারদের ব্যবহৃত কাঠের আসবাবপত্র। সেই সমস্ত খাট-পালঙ্ক, সিংহাসন, টেবিল-চেয়ার ও কাঠের বেড়ার মধ্যে কিছু মোটিফের সন্ধান পাওয়া যায়। যেগুলো থেকে অনায়াসেই অনুমান করে নেওয়া যায় কি ধরনের দারুকর্ম কি মানের শিল্প সেসময়ে সম্পন্ন করেছেন দারুশিল্পীরা। তাহলে আমরা শিল্প বলতে যা বুঝি সেই আলোকে যদি দেখি তাহলে বোঝা যায় তখনকার শিল্পীরা তাঁদের মনের মত করে মোটিফ খোদাই করে তাতে নান্দনিকতার রূপ ফুটিয়ে অপূর্ব এক শিল্প নিদর্শন বা দারুকর্মগুলো সম্পন্ন করেছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে দারুশিল্প করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রয়োজনের সামগ্রীও যেমন আছে তেমনি শুধু নান্দনিকতার জন্যেও তৈরি শিল্পকর্ম আছে। এখানে প্রয়োজনের নিরিখে যেসমস্ত দারুশিল্প দেখা যাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে আছে নৌকা, খাট-পালঙ্ক, সিংহাসন, পিলার, সিংহদ্বার, রথ ও পিড়ি।

শিল্প সবসময় পৃষ্ঠপোষকতায় সার্থক রূপ লাভ করে আর মধ্যযুগে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে সওদাগর ও রাজ-রাজারা স্বয়ং হস্তে। কারণ, এই সময়ে রাজার শাসন ছিল। রাজাদের জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত গোছানো পরিপাটি, তাদের বসার ঘর, শোবার ঘর, খাবার ঘর, রাজদরবার ইত্যাদি ছিল পৃথক পৃথক। তারা একধরনের আয়েশি জীবন যাপন করে অভ্যস্ত ছিল। শিল্পের প্রতি একধরনের ভালবাসা কাজ করেছে। তাই তাঁরা তাঁদের রাজদরবারে রাজসভায় কবি, শিল্পীদের সম্মানিত স্থান করে দিয়েছিলেন। যার ফলে আমরা দারুশিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শনগুলো সংখ্যায় কম হলেও দেখতে পারছি। আমরা যদি ঐসময়ের প্রাপ্ত দারুশিল্প যেমন– খাট-পালঙ্ক, সিংহাসন, স্তম্ভ ইত্যাদি যেগুলো জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে সেগুলোর দিকে তাকাই তাহলে আমাদের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ঐসমস্ত আসবাবপত্রে কি ধরনের মোটিফ

দারুশিল্পীরা খোদাই করে বের করত। যেমন– সিংহাসনে দেখা যায় দুই হাতলে সিংহের মাথা, পায়াগুলো হত সিংহের পায়ের থাবা খোদাই করে তৈরি করা। পালঙ্কের পায়ায় দেখা যায় পরির মূর্তি, স্তম্ভে দেখা যায় নারীমূর্তি, যদিও এগুলো প্রয়োজনের নিরিখে তৈরি তথাপি এগুলোর শিল্পমান এতটাই উন্নত যে এই শিল্পগুলোকে শুধু কাঠমিস্ত্রি বা সূত্রধরদের কাজ বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যায় না। ঠিকও হবে না। কেননা দারুশিল্পিরা তাঁদের কাজে যে আকার-আকৃতি, রেখা, বুনট ইত্যাদি শিল্পের বিভিন্ন উপাদান ও নীতি ব্যবহার বরেছেন তা ছিল শিল্পীর ইচ্ছানুযায়ী। শিল্পী স্বাধীনভাবে চিন্তা করে নিজস্ব কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে শিল্পকর্মে তা মূর্ত করেন। যা আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছিলাম যে, শিল্পী কখনো অনুকরণ করেন না, তিনি বাস্তবে যা দেখেন তা হুবহু চিত্রিত করেন না, তিনি তাঁর মত করে রূপ দেন। এই আলোকেও দেখলে বোঝা যায় মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রাপ্ত দারুনিদর্শনগুলো কোন্ মানের এবং এই শিল্পের স্বরূপ কেমন। আবার রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় ব্যবহৃত দারুকর্মগুলো, কাঠে খোদাইকৃত নানা চিত্রগুলো যে করা হয়েছে সেগুলোর শৈল্পিক মূল্য অনেক। তখনকার মানুষের মধ্যে যে কী পরিমাণ সৌন্দর্যবোধ কাজ করত তা এ থেকে বোঝা যায়। এখানেও শিল্পী তাঁর স্বাধীন সত্তা ব্যবহার করে এই শিল্পকর্মগুলো করেছেন। এসমস্ত শিল্পে অনুপাত, ভারসাম্য ও ঐক্য বিদ্যমান। ভাল করে খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে আন্তরিকতার কোন অভাব নেই, ফলে এগুলোও শিল্পমান বিচারে উত্তীর্ণ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের দারুশিল্প নিদর্শনের তুলনা

এখন যদি আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাপ্ত দারুনিদর্শনগুলোর তুলনামূলক আলোচনায় যাই তাহলে এটা স্পষ্ট যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের দারুকর্মগুলো বেশিরভাগই ব্যবহারিক যা কারুশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাপ্ত দারুনিদর্শনগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে

১. ধর্ম সম্বন্ধীয়–দেব-দেবীর, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনা কেন্দ্রিক বর্ণাত্মক চিত্রকর্ম।
২. বাদ্যযন্ত্র, খেলনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু, যেমন-
   ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, সেতার, এস্রাজ, সারিন্দা, ডুগডুগি, পুতুল, ছোট গাড়ি, নৌকা, ছড়ি, হুঁকা, পানদান, ঢেঁকি ইত্যাদি।
৩. আসবাবপত্র-সিংহাসন, খাট
   পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, সিন্দুক, প্রসাধন টেবিল, আলমারি, গয়নার বাক্স, টাকার বাক্স, অলংকৃত দরজা, বেড়া, স্তম্ভ, খিলান ইত্যাদি। (রহমান, ২০০৯)

বর্ণিত দারুশিল্পের খোদাইকর্ম অত্যন্ত নিখুঁত, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত। স্পষ্টতই বোঝা যায়

হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিতে এই শিল্পকর্মগুলো পুরুষ পরম্পরায় চর্চিত হয়ে আসছে। গুরুপরম্পরায় চর্চিত এই শিল্পকর্মের সকল শিল্পীই যে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছে তা নয়। যে শিল্পীগণ সাফল্যের চূড়ান্ত ছুয়েছেন তাঁদের শিল্পকর্ম দেখে বিস্ময় উদ্রেক হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাপ্ত দারুশিল্পের শিল্পমান তুলনামূলকভাবে কোন অংশে কম নয়। আর মধ্যযুগের দারুশিল্পগুলো কিছুসংখ্যক ব্যাবহারিক হলেও তা শিল্পমান উত্তীর্ণ। তুলনামূলক বিচারে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীনযুগের দারুশিল্প ও মধ্যযুগের দারুশিল্প খুবই উঁচুমানের এবং একই ধরনের। শিল্পমান বিচারেও উত্তীর্ণ।

উপসংহার

বাংলার হাজার বছরের শিল্প ঐতিহ্যকে পাই এই প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্প-সাহিত্যিকদের রচনায়। বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম দরদ প্রাচীন ও মধ্যযুগের দারুশিল্পীদের কাজ দেখলেই তা অনুমান করা যায়। এই ঐতিহ্য চেতনা বাঙালিদের জীবনাদর্শের মর্মমূলে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। বাংলার গ্রামীণ জনজীবন তাদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি তথা বাংলার লোকজ সংস্কৃতিরও প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁদের কাজে। একখণ্ড মৃত কাঠ শিল্পীর সৃজন ক্ষমতার অসাধারণ নৈপুন্যে ব্যঞ্জময় হয়ে উঠত। শিল্পীর মনের কথা বাটালির সাহায্যে খোদাইয়ের মাধ্যমে চিত্ররূপ পেত একখণ্ড কাষ্ঠফলকে। শুধু মানুষজন নয়, কাঠের বুকে খোদাইকৃত চিত্রে দেখা যেত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, নর্তকি, সুরসুন্দরী, মা ও শিশুর মূর্তি, ছুটন্ত রথ, শিকার দৃশ্য, মৈথুন দৃশ্য, যুদ্ধ দৃশ্য, সৈনিক, রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার নানা দৃশ্য, বিভিন্ন প্রাণী, পশুপাখি, মাছ, নদী নৌকা, বৃক্ষলতা ইত্যাদি নানা মোটিফ। *নীহাররঞ্জন রায়* তাঁর বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, “সূত্রধর যে শুধু কাঠমিস্ত্রী, তাহাই নয়; আমাদের প্রাচীন বাস্তু শাস্ত্রে (যেমন, মানসারে) সূত্রধর বলিতে স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকার, কাঠমিস্ত্রী সকলকেই বুঝাইত। কাঠের শিল্পের প্রচলনও কম ছিল না। কাঠের তৈরি ঘরবাড়ি কালের ভ্রুক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া আজ আর বাচিয়া নাই, কিন্তু স্তম্ভ, খিলান, খুটি ইত্যাদিও ২/৪টি আজও যাহা পাওযা যায় তাহাদের কারু ও শিল্পনৈপূন্য বিশ্বয়কর। ঢাকার চিত্রশালায় তেমন নিদর্শন কয়েকটি আছে। সংসারে আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, গোরুর গাড়ি, রথ বিশেষভাবে নদীগামী নানা প্রকার নৌকা ও সমুদ্রগামী বৃহদাকৃতি নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি সমস্তই তো ছিল কাঠের সেই দিক দিয়া দেখিলে কাষ্ঠ শিল্পের সম্মৃদ্ধি সহজেই অনুমেয়, এবং সমাজের মধ্যে এই শিল্পের স্থানও ছিল”। (রায়, ১৪২০বাং)

খাট-পালঙ্ক, নৌকা ও বিভিন্ন রকমের আসবাবপত্র এগুলোই হল প্রাচীনকালের সাহিত্যে প্রাপ্ত দারুশিল্পের নিদর্শন। খাট-পালঙ্ক, নৌকা এবং বিভিন্নরকমের আসবাবপত্রে দারুশিল্পীরা বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে নকশা করেছেন। এই সমস্ত

আসবাবপত্রে বিভিন্ন ধরনের মোটিফ ব্যবহার করে নকশা খোদাই বা দারুকর্ম করা হয়েছে তার বিস্তারিত উল্লেখ আমরা পাই। তবে আশার বিষয় হল তিন ধাতু মানে সোনা, রুপা, কাঁসা-পিতল দিয়ে যেখানে খাটের নকশা করা হয়ে থাকে সেখানে যে খুব উন্নতমানের দারুকর্ম করা হয়েছে তা প্রমাণিত। এবং দারুশিল্পীরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী মোটিফ ও উপাদান ব্যবহার করে নান্দনিকতা সৃষ্টি করে শিল্পকর্ম করতে পেরেছেন তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এই আলোকে বিচার করলে প্রাচীনকালে প্রাপ্ত এই দারুনিদর্শনগুলো শিল্পের মর্যাদা পায়। কিন্তু এই শিল্পগুলোর একটা ব্যবহারিক দিক রয়েছে, সেই বিচারে গেলে প্রাচীনকালের সাহিত্যে প্রাপ্ত দারুশিল্পের এই নিদর্শনগুলো কারুশিল্পের পর্যায় পড়ে। কারণ নান্দনিক উপস্থাপনাসহ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে যা ব্যবহার হয় তাকে কারুশিল্প বলা হয়। অন্যদিকে *ভরত-নাট্যশাস্ত্রে* প্রাপ্ত নিদর্শন হল 'রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ'। রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের বিভিন্ন অংশে যেমন, রঙ্গপীঠ, রঙ্গশির, চতুরঙ্গ মণ্ডপ ইত্যাদিতে দারুকর্মের কাজ বা দারুনকশা করা হয়। এখানে এই নকশাকার্যে কিছু মোটিফের নাম পাওয়া যায়। যেমন, সিংহব্যাঘ্রাদি জন্তু, অট্টালিকা, নানারকম পুতুল, বেদি, যন্ত্রজালগবাক্ষ ইত্যাদি। আর স্তম্ভগুলোতে স্ত্রীমূর্তিরূপও খোদাই করা দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে এই মোটিফগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, এগুলো কোন সাধারণ নকশা নয়। শিল্পমান সম্মৃদ্ধ কাঠ খোদাই কাজ যাকে ভাস্কর্যও বলা যেতে পারে। এই কাজগুলো দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক উভয় রকম ছিল। কাঠে সিংহ-ব্যাঘ্র ও নারীমূর্তি খোদাই করে বের করে আনা খুব সহজ কাজ নয়, অত্যন্ত কঠিন কাজ। অতিশয় দক্ষ হাত এবং ড্রইংয়ে গভীর জ্ঞান ও অনুশিলন ছাড়া এই কাজ করা যারতার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আন্তরিকতাপূর্ণ অতিশয় দক্ষ হাতে করা সে কাজগুলো নিশ্চিতই বলা যায় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। এখানে শিল্পী তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে স্বাধীন কল্পনাপ্রসূত মোটিফ ব্যবহার করে নান্দনিকতার উদ্দেশ্যেই এই শিল্পকর্মগুলো সম্পন্ন করেছেন। তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় এই দারুশিল্পগুলো চারুশিল্পের পর্যায় পড়ে। কেননা চারুশিল্প হতে হলে যে সমস্ত গুণ বা শর্ত থাকা জরুরি তার সবই আছে এইসব দারুশিল্পকর্মে। অনুমান করা যায় এবং একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলার দারুশিল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য অন্যান্য শিল্পবৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। অর্থাৎ বিভিন্ন মাধ্যমে চর্চিত বাঙালির শিল্পরীতি ও বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। সুতরাং বলা যায়, বাংলার দারুশিল্প বাঙালির ঐতিহ্য সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম।

সহায়ক গ্রন্থ

আলাওল, (২০০২), পদ্মাবতী, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

আহসান, সৈয়দ আলী, (২০০৪), শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ২।

ইসলাম, জহিরুল, (২০১৮), পদ্মাপুরাণাশ্রিত নাটক : রূপান্তরের ধারা, পিএইচডি অভিসন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত দিতীয় সেমিনার পত্র, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাবি, পৃ. ০১।

ইসলাম, নজরুল, (১৯৯৫), সমকালীন শিল্প ও শিল্পী, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ২১।

করিম, ড. নেহাল ও সেলিম, ড. মিয়া মুহম্মদ, (২০১৬), সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ [সম্পাদনা], ঢাকা : সংরক্ষণ প্রকাশন, ।

ঘোষ, বিনয় (১৯৭৯), বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, কলকাতা : সিগনেট বুকশপ, পৃ. ৪০৬।

চক্রবর্তী, পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত, বাইশ কবি মনসা পুঁথি, [সংকলিত] কলিকাতা : স্ট্যান্ডার্ড।

জয়ানন্দ, (২০০৬), চৈতন্যমঙ্গল, বিমান বিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা : দি এশিয়াটিক সোসাইটি।

জায়সী, (২০০৯), পদ্মাবতী, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (২০১২), শিল্পচিন্তা, তাহমিনা চৌধুরি ও অসীম চট্টোপাধ্যায় [সম্পাদিত] কলকাতা : দীপায়ন, পৃ. ২০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড, কলিকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, (১৯৯৩), বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড : ১ম পর্ব, কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র ও চক্রবর্তী, ড. ছন্দা, (২০০৯), ভরত নাট্যশাস্ত্র, [সম্পাদনা], কলিকাতা : নবপত্র প্রকাশন, পৃ. ৩১, ৩২, ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (১৪০৪ বঙ্গাব্দ), ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী [সম্পাদনা]

ভাদুড়ী, অগ্নিবর্ণ, (১৯৮৬), এ কালের শিল্পচিন্তা, কলকাতা : সুবর্ণরেখা।

ভট্টাচার্য, অমিত্র সূদন, (১৯৯২), বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, [সম্পাদনা] কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

মৌলিক, শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র (১৯৭১) প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, [সম্পাদনা] কলিকাতা : ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, পৃ.?।

মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ, (২০১৫), বৈষ্ণব পদাবলী [সম্পাদনা] কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ।

মৌলিক, শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র (১৯৭১) প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, [সম্পাদনা] কলিকাতা : ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, পৃ.?।

যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ, (১৯৭৪), শুকুর মাহমুদ বিরচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস [সম্পাদনা] ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

রায়, নীহাররঞ্জন, (১৪২০ বাং), বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৫১।

রহমান, লুৎফর, (২০০৯), বাংলা সাহিত্যে নন্দনভাবনা প্রাচীন ও মধ্যযুগ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩৪৮।

সাত্তার, ড. আব্দুস, (২০০৩), প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ১৮।
সাত্তার, ড. আব্দুস, (২০০৬), বাংলাদেশের নতোন্নত দারুশিল্প, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সগীর, শাহ মুহম্মদ, (১৯৯৯), ইউসুফ-জোলেখা, ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।
সাঈদ, শামসুল আলম, (২০১২), চর্যাপদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা, [সম্পাদনা] ঢাকা : অ্যাডর্ন, পৃ. ৬১।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।
সেন, সুকুমার, (১৯৯৩), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডিমঙ্গল, [সম্পাদনা] নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি।
সেন, সুকুমার, (১৯৯১), বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত [সম্পাদনা] নতুন দিল্লি : সাহিত্য আকাদেমি।
সেন, শ্রীদীনেশ চন্দ্র ও বাহাদুর, রায়, (১৯৯৭), মৈমনসিংহ-গীতিকা, [সংকলিত] কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
সেন, দীনেশচন্দ্র, (২০১৮), বৃহৎ বঙ্গ ১ম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
সেন, দীনেশচন্দ্র, (২০১৮), বৃহৎ বঙ্গ ২য় খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
হক, এনামুল, (১৯৯৯), ইউসুফ-জোলেখা, [সম্পাদিত], ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৫৪।
হক, হাসান আজিজুল, (২০১২), বঙ্গ বাংলাদেশ, [সম্পাদনা] ঢাকা : সময় প্রকাশন, পৃ. ২২।
হায়দার, বদরুল (১৯৯৬), জীবাননন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা [সম্পাদনা] ঢাকা : স্বদেশ প্রকাশনী, পৃ. ১১৫।
https://bn.wikipedia.org/wiki/পদ্মাবতী–Access date, 24.05.19